হারানো খাতা

উপন্যাস

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

তিন টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

কার্তিক—১৩৬০

অঞ্জলী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে—

সাম্‌নে তুমি নেইকো আজি আছ আমার মনের মাঝে,
অতুল তোমার মুখের ছবি মানস পটে নিত্য রাজে।
"হারাণো" এই "খাতা" আমার হারানিধির কচি হাতে,
উদ্দেশে আজ দিলাম তুলে অশ্রুজলের মালার সাথে।

—ভাঁড়

উহাতেই, জল-বিহার করিতেছিলেন। এদিকে সেদিকে দুচারিটি কণ্ঠি-তিলকপরা উড়িয়্যাবাসী মালী ক্ষিপ্রহস্তে এগাছ ওগাছ হইতে ফুল-পাতা ছিঁড়িয়া সঙ্গে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে তোড়া বানাইতেছিল। রাজা-বাহাদুরের বন্ধুবর্গ অন্যমনস্কভাবে অলসকণ্ঠে গান ধরিয়াছে,—

হেলা ফেলা সারাবেলা
একি খেলা আপন সনে—
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।

ফটকের বাহিরে হাতীর মত বড় দুইটা কালো ঘোড়া যোতা একখানা ঝকমকে ল্যাণ্ডো ইহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাবুদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া ঝুটাজরির চমকদার পোষাকপরা চাপরাশি সহিস ও কোচম্যান, যাত্রার দলের ভীমসেনের মত গালপাট্টাওয়ালা, দীনদরিদ্রের সাক্ষাৎ শমনসদৃশ বাগানবাড়ীর দ্বারপালেরা আভূমি নত হইয়া সেলাম ঠুকিল।

রাজা নরেশচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নলীন! "আজ বাড়ীই ফেরা যাক।—আর একদিন তোমাদের গান শোনা যাবে।"

নলীন বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছিল সেই সুপরিচ্ছদধারী ভদ্রলোক ঈষৎ অভিমানভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছাড়াছাড়া কথায় জবাব দিলেন, "সে আপনার অভিরুচি। আমি আর তা'তে কি বলবো বলুন? তবে দেখুন, সব বিষয়েরই ত একটা সীমা আছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনি যেন সেই সীমাটা না ছাড়িয়ে যান, এইটুকুই শুধু আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া।"—এই বলিয়া আর [illegible] দিকে চাহিয়া নলীনবাবু নিজের যুক্তিটাকে আর একটুখানি জোর দিবার জন্যই

যেন সাক্ষ্য মানিয়া কহিলেন, "কি বল হে ননীবাবু! অত বাড়াবাড়ি কি ভাল?"

ননীবাবু এইভাবে সম্বোধিত হইয়া বিপন্ন বোধ করিতেছিলেন। এই লোকটী নরেশচন্দ্রের ধাতুর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। সকল বিষয়েরই চরমে গিয়া পৌছানই যে ওই মানুষটীর প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ বা দোষ এ খবর সে জানিত, তাই বিপক্ষে মত দিতে গিয়াও তার বাধিল।

নরেশ অসহিষ্ণু হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাবের উচ্ছ্বাসে সীমা যদি কোথাও ছাপিয়ে পড়ে আমি তাতে দোষ দেখিনে। মাপকাটি দিয়ে মেপে মেপে যে পথচলা, তারচেয়ে আমার পক্ষে অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁৎরে পার হওয়াও ঢের সহজ।"

কণ্ঠের স্বরে ও ভাবে অসন্তোষের আমেজ বুঝিয়া সহচরেরা নিজেদের পথ চিনিয়া লইল। ননী বলিল, "আমারও সেই মত। রাজার এখন 'রাণীসদনে' হাজির হওয়াই সঙ্গত।"

রাজার প্রবীণ বন্ধুটী এতক্ষণ স্রোতের গতি পর্য্যবেক্ষণে নিবিষ্ট ছিলেন; এতক্ষণে নিজের আসরে নামিবার সময় আগত বুঝিয়া একটু সরিয়া আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা বই কি! নাতি আমার এখন ঘরে নূতন রাণী এনেছেন, কুটীরবাসী হতে যাবেন কোন দুঃখে! ওসব পচা পরামর্শ তুমি কাণে তুলোনা ভায়া, চটপট গাড়ীতে উঠে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে পদপল্লবে হাজির হওগে। যদি ইতিমধ্যেই মানভঞ্জনের ব্যবস্থা দেখ, তাহ'লে এম্‌নি করে গাইবে,—

'ভাঙ্গবো বাঁশি ত্যজবো প্রাণ,
রাধে! এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,
নহে,—এই পায়ের নূপুর বেঁধে গলে—
আমি পশির যমুনা জলে—'

"আরে দাদা, এ যে রীতিমত কেত্তন সুরু করে দিলে। তবে না হয় আর একটু বসে গানটার শেষ পর্য্যন্ত শোনাই যাক্ না।"

"ঠাকুদ্দা আমাদের যত বুড় হচ্চেন, ততই ওঁর রসের ধারা প্রাণের মধ্যে থেকে উথ্‌লে উঠে উপ্‌চে পড়চে।"

"ঠিক বলেচ দাদা ভাই! এরই জন্যেই না শিং ভেঙ্গে বৎসবৃন্দের মধ্যে বিরাজ কর্‌চি। বলি কি যৌবনের ওই সহস্র বাতির মুখ থেকে একটু একটু ফিন্‌কিও যদি উড়ে এসে এই পোড়া শল্‌তেটায় কোন গতিকে ঠেকে যায়!"

উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যে শব্দবিরল কাননপথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

ক্ষণপরে নরেশচন্দ্র বলিলেন, "কি গ্রহ! আজ কি এইখানেই রাত কাটাবে নাকি?"

ঠাকুরদা আলস্যবিজড়িত ভঙ্গিতে কহিয়া উঠিলেন, "তা যদি বল্লে ভায়া তবে বলি—তোমার ঠান্‌দির স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়ায় ঘরটান তো আমার ফুরিয়েই গেছে। আজ এই কুঞ্জবনটার মায়া যেন আমার কাটতেই চাইচে না!"

"নিকুঞ্জ কাননে রাধা শ্যামসোহাগিনী, আপনি এখন রাধাভাবে আছেন নাকি?"

তা না হয় থাকলে—কিন্তু এখানে তো অপর্য্যাপ্ত ফুলের গন্ধ ও মলয় সমীরণ সেবন করেও তোমার ওই রাক্ষুসে পেট ভরবে না দাদা!

[illegible]! তোরা এখনও নেহাৎ নাবালক আছিস! ওরে, ঘোষালকে কি তেমনই কাঁচা ছেলে পেয়েছিস্ তোরা? এই ক্যাম্বিসের ব্যাগে যা ভরে নেওয়া গেছে, সে তোদের মতন চারটে জোয়ান-মর্দ্দর খোরাক। তার উপর এবেলা তোরা মুখ্যুরা যখন সরবতের

গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলি, আমি সেই সুযোগে ওবেলার অবশিষ্ট তালশাঁস সন্দেশগুলো আর গোলাপজলভরা রসগোল্লা গণ্ডা কতক পার করে দিয়েছি।”

“শোন কথা! ঠাকুরদা বলে কিরে? এ কুম্ভকর্ণ দাদাটীকে ঘাড়ে নিয়ে পুষ্‌তে ভাই তোমাদের মতন রাজারাজড়াদেরই পোষায়! আমাদের মত হাল্কা কাঁধে—”

“যাঃ—আমাকে কি তেম্‌নি ছ্যাবলা পেয়েছিস রে! আমি নিজের ভার সইবার মতন একটা আশ্রয়ও খুঁজে নিতে পারিনে? জান না কি মাধবিকা সহকার তরু ব্যতীত অপর কাহাকেও আশ্রয় করে না—”

আবার একটা তরল হাস্যতরঙ্গ উত্থিত হইয়াই মধ্যপথে অকস্মাৎ কিসের একটা বাধায় চকিত হইয়া থামিয়া গেল।

ফটকের পাশেই যে প্রকাণ্ড পাকুড়গাছটি অনেকখানি স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ হইতে একটা আকস্মিক ক্ষীণস্বর ভাসিয়া উঠিয়াছিল, “অনাহারে প্রাণ যায়, যদি কেউ একটুখানি দয়া করেন—”

একসঙ্গে সবকয়টা চোখের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হইল। ব্যাপার এমন কিছুই অসাধারণ নয়! সদাসর্ব্বদা যেমন ছিন্ন পরিহিত দীন ভিখারীকে ওই সব জায়গাতেই দেখা সম্ভব, এও ঠিক সেই ব্যাপার! ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়পরা একটা অনশনক্লিষ্ট কঙ্কাল-শীর্ণ ভিখারী পথিক পথের ধারে দারুণ নৈদাঘ রৌদ্রের আপদাহ নিবারণার্থে গাছের ছায়ার আশ্রয় নিয়াছিল কাতরকণ্ঠে প্রবল অভাব জ্ঞাপন করিয়া ধনীবৃন্দের প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের এক কণা মাত্র ভিক্ষা করিতেছে।

এই তো জগৎ! সংসারের নিয়মই ত এই! সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজসিংহাসনের পদতলে অনশনব্রত ভিখারীর ধূলিশয্যা, এ ত আজ নূতন

নয়! এ সংসারে জন্মিয়া এই দুঃখের মাঝখানেই মানুষের জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে। এ দুঃখে মানুষ অহরহই ত ডুবিয়া আছে। এর চেয়ে সহনীয় বলিতে গেলে আর কিছুই নাই। যে ঐশ্বর্য্যের উচ্চসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সে ভ্রমেও ভাবেনা তার সেই সম্মানের আসন কত দুঃখার্ত্তের মুখের অন্নগ্রাস কাড়িয়া রচিত। ভাবিয়া দেখে না, যে দীন দরিদ্রের বক্ষ আজ সামান্য কীটানুর মতই অনায়াসদর্পভরে মোটরের চাকায় মর্দ্দিত করিয়া সে অবিচলিত ভাবে চলিয়া যাইতেছে, তার সে দর্পও সেই অবহেলিত নগণ্যের কৃপার দান। বস্তুতঃ, দরিদ্র বড় সহিষ্ণু, সে নিজে অনাহারে থাকিয়াও ধনীর অত্যাচার নীরবে সহিয়া যায়, তাই না তারা তাদের এমন করিয়া দলিতে অবসর পায়। এরা যদি একবার নিজের শক্তি বুঝিয়া ধনীর অত্যাচারের প্রতিবিধান চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তবে মহামহৈশ্বর্য্যময় সিংহাসনও যে সেই দারিদ্র্যশক্তির পদতলে চূর্ণিত হইয়া ধুলিধূসর হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহারও প্রমাণাভাব নাই। তা যাক্ সে কথা—ভিখারীটার প্রতি নজর পড়িতেও একটা তাচ্ছল্যভরা অধরকুঞ্চনেই ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারিত, যদি না ঠিক সেই সময়েই রাজাবাবুর দ্বারবান ও পদাতিকদ্বয় রাজাবাবুকে সেই অভাগাটার দিকে চক্ষু ফিরাইতে হওয়ায় নিজেদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি বোধে হতভাগ্য ভিখারীর দিকে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া যাইত!

"এই বদ্‌মাস্! এই শালে! হিঁয়া কাহে বৈঠা হো! জলদি নিকালো হিঁয়াসে"—এবং ইহাতেও তাহাকে পলায়ন পরাঙ্মুখ দেখিয়া দুইজনে দুইটা হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টভাষায় "নিকালো শালে", "ভাগো হিঁয়াসে", "তু চোট্টা হায়" ইত্যাদি প্রিয় সম্ভাষণও চলিল।

লোকটা উঠিল না, নিঃশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। কিন্তু তাই

বলিয়াই বড়লোকের নিমকহালাল ভৃত্যবর্গের বজ্র-কঠিন হস্ত হইতে মুক্তি পাইল না।

"এঃ চোট্টা আদমি ঢং দেখাতে হো—" বলিয়া যদুনন্দন চৌবেজী নিজের সরল শালযষ্টিবৎ দেহখানি ঈষৎ বক্র করিয়া তাহাকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইতে গিয়া সহসা পিছনে একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোরকণ্ঠের সম্বোধনে বিস্ময়ে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল যে, সেই—"ওঝা! চৌবে! তফাৎ যাও!" বলিয়া তাহাদের অক্ষুণ্ণ মহিমার খর্ব্বকারী, স্বয়ং তাদেরই রাজাবাবু!

ক্ষুব্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহারা শিকার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

নরেশচন্দ্র লাঞ্ছিত ভিখারীটার নিকটে আসিয়া ব্যগ্র-করুণকণ্ঠে বলিলেন, "এরা তোমায় লাগিয়ে দিয়েছে? আহা, তোমার দুদিন খাওয়া হয়নি বল্‌ছিলে না? এই নাও—"

কোন সাড়া নাই। সন্ধ্যার ছায়ায় বৃক্ষপত্রের সমাবেশে ভাল করিয়া দেখা গেল না, তথাপি যতটুকু দেখা যায় তাহাতে বুঝা গেল যে, গাছের তলায় যে লোকটা পড়িয়া আছে, বক্ষে তাহার স্পন্দন নাই। নরেশচন্দ্রের সর্ব্বশরীরে একটা অতর্কিত ভয়ের বেদনা তাড়িৎ হানিয়া গেল।—এই মুষ্টিভিক্ষার কাঙ্গাল হতভাগ্যকে, মাত্র তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাওয়ার অপরাধে তাঁহারই অন্নপুষ্ট লোক দুইটা মারিয়া ফেলিল নাকি?

তৎক্ষণাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিতেই তাঁর অন্তরের সমস্ত মমতাসাগর এককালে বিমথিত করিয়া যে মুখখানা চোখে পড়িল, তাহা তাঁহার শরীর মনে একটা অজ্ঞাত শিহরণও আনিয়া দিল।—কত ক্ষীণ, কত পাণ্ডুর এবং কি ভীষণই সে মুখ।—উঃ কি ভীষণ!—মানুষের যে তেমন মুখ হয়, তাহা যেন ইহার পূর্ব্বে অনুভূতিই ছিল না। এক লহমায় সেই আয়ুৎ-

পাতের মধ্য দিয়া সেখানকার দিকে চাহিতে গভীর মমতা বেদনা এবং আতঙ্কের মিশ্রণে এই ভাবটাই মনে জাগিল। পরক্ষণে চিত্রাপিতের স্থায় দণ্ডায়মান দ্বারবানদের সম্বোধন করিয়া "জলদি পানি লে আও"—হুকুম দিয়া ততোধিক বিস্ময়স্তম্ভিত বন্ধুবর্গের দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন, "করুণা! এর পালস্‌টা দেখে যাও তো।" ততক্ষণে কণ্ঠস্বরে স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

ডাক্তার করুণানিধান সঙ্কোচের সহিত কাছে আসিয়া বলিলেন, "কে তাও ঠিক নেই, কি রোগ, কাপড় চোপড় যাচ্ছেতাই, ওকে ছোঁয়ানেপা কি ঠিক?"

নরেশ কহিলেন, "তোমরা হাসপাতালের মড়া ঘাঁট। এ হয়ত এখনও বেঁচে আছে, ছুঁতে দোষ কি?

করুণা ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে সসঙ্কোচে ভিখারীর হস্ত স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমরা ডাক্তার, আমাদের সবই করতে হয়, সে আমি বলছিনে, তোমার কথাই বলছি। হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছে বটে; তবে বড্ড দুর্ব্বল—কিছু খেতে না পেলে বোধ হয় বেশীক্ষণ বাঁচবে না।"

সদ্যপ্রত্যাবৃত্ত চৌবের নিকট হইতে জলের লোটাটা লইয়া, মূর্চ্ছিতের মুখে জলের ঝাপটা দিয়া, নরেশ উহাকে আদেশ করিলেন, "চৌবেজি, বহুত জলদি গরম দুধ তো লে আনে হোগা।"

হুকুম শুনিয়াই বৃদ্ধ চৌবেজীর মনের উষ্মা বাষ্পাকারে বাহির হইয়া আসিল—"আরে মহারাজ! আপ হুকুম তো দেদিয়ে—লেকিন হাম কাঁহাসে এত্তা জলদি গরম দুধ কা বন্‌বস্ করে?—ইয়ে আপ্ কা কল্‌কত্তা সহর হ্যায় কি যো, যো—"

নরেশ বিরক্ত হইয়া কি বলিতে যাইতেই করুণাবাবু কহিলেন,

"সত্যি এখানে এক্ষুনি দুধ পায় কোথায়? তা কাজ নেই সে চেষ্টায়, আমার কাছে এক শিশি 'ষ্টিমুলেণ্ট' আছে, তাই থেকে আউন্সটাক জল মিশিয়ে খাইয়ে দিলেই বেঁচে যাবে 'খন।"

মূর্চ্ছাহত ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাশ ফিরিল, অল্পপরে চোখ মেলিল, এবং পদাতিকের আনীত গাড়ীর লণ্ঠনের তীব্র আলোকে স্বপ্ন-দৃষ্টের মতই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তার মুখের উপর নত হইয়া নরেশ ডাকিলেন, "একটু বল পেলে কি? কিছু ভাল বোধ হচ্ছে?"

লোকটী ক্ষণকাল নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "হুঁ।"

ডাক্তার আবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য করিলেন, "বাপ্! মানুষের নাড়ী এত ক্ষীণও হয়! ওহে কর্ত্তা আজ রাতটা এইখানেই চুপটী করে পড়ে থাকো।—দেখ চৌবেজি! কাল সকালে ওকে একটু দুধ টুধ খেতে দিতে পারবে তো? সকাল বেলা—এখন বল্‌ছি না।"

চৌবে অসন্তোষের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া জবাব দিল, "জি হুজুর!"

"ব্যাস্! তা'হলেই এক রকম চালিয়ে নেবে আর কি! এসো হে রাজা! রাত হয়ে যাচ্ছে। আমাকে আবার বর্ম্মণদের ওখানে ৯টার সময় কল দিতেই হবে। কত হলো? এঃ সাতটা পঁচিশ—এসো এসো।"

নরেশ বন্ধুর ব্যস্ততা গ্রাহ্য না করিয়া ভিখারীর সহিত কথা কহিয়া বলিলেন, "দেখ, এই দারোয়ানগুলো বড় নিষ্ঠুর, ওরা আর একটু হলেই তো তোমায় মেরে ফেলেছিল, ওদের হাতে দেওয়া আর এই গাছ-তলায় ফেলে দেওয়া একই কথা। তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে

পারবে? তা'হলে দুচার দিন একটু খেয়ে দেয়ে জোর পেয়ে যেতে পারতে। দেখনা একটু চেষ্টা করে।"

কথাটা শুনিয়া নরেশচন্দ্রের সঙ্গীদলের মধ্যে গভীর বিস্ময়ের স্তব্ধতা জাগিয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে তার প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার একটা স্রোতও প্রবাহিত করিয়া দিল। আর সেই মুমূর্ষু ভিখারী?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আজি এসেছি তোমারই দেশে,
আমি, অতিথি তোমারই দ্বারে, ওগো বিদেশিনী।"

—রবীন্দ্রনাথ

পরদিন প্রভাতকৃত্য সমাধার পর খবরের কাগজ হাতে লইবামাত্র গত রাত্রির ভিখারীর ভীষণ মুখখানা নরেশচন্দ্রের মনে উঁকি দিয়া গেল। মনে করিতেই সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। ঈষৎ লজ্জার সহিত মনে হইল, লোকে যে বলে তাঁর সকল কাজেই বাড়াবাড়ি—তা হয়ত খুব মিথ্যা নয়! রোগজীর্ণ ভয়ানক মূর্ত্তি সেই ভিখারীটাকে তাঁর দ্বারবানেরা অকারণে নিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়া তাকে দুটো টাকা দিয়া অথবা হাসপাতালে পাঠাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইত। পাঁচজন ভদ্রসন্তানের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া তাকে তাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে চড়াইয়া বাড়ী লইয়া আসা একটু বেশী! গাড়ীতে আবার সে মূর্চ্ছিত হয়। নীচের ঘরে বিছানা পাতিয়া শোয়ান, ডাক্তার ডাকা, দুধ, বরফ, বলকারক ঔষধ এসব অবশ্য করিতেই হইল। এ লইয়া স্ত্রী চটিয়া উঠিলে তার চেয়েও বেশী চটিয়া কঠিন তিরস্কার, আবার তার কান্না দেখিয়া স্নেহার্দ্র হইয়া মানভঞ্জন।—নাঃ—এতটা না করিলেও চলিত!'

কিন্তু তখন যেটা না করিলে চলিত—সেটা যখন করা হইয়া গিয়াছে —এখন মনে মনে লজ্জিত হইলেও চারা নাই। যাহোক শেষ মীমাংসা করিতে হইবে। লোকটাকে গাড়ী ডাকাইয়া সরকার মশাইকে সঙ্গে দিয়া হাসপাতালেই পাঠান যাক্। মধ্যে মধ্যে খবর নেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে, সুস্থ হইয়া উঠিলে কিছু দেওয়া যাইবে।

নরেশচন্দ্র উঠিয়া গেলেন।

রোগী তখনও বিছানায় পড়িয়াছিল। ঘরের সব দোর জানালা বন্ধ। একটা জানালা খুলিতেই প্রভাত সূর্য্যের এক ঝলক কনকরশ্মি অঞ্জলিভরা স্বর্ণরেণুর মত সেই তাপিতের পাণ্ডু দেহের উপর যেন উপহাসের বক্র হাসির মতই ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সেই আলোর ঝিলিক যেন ওই বিশীর্ণ আড়ষ্ট শরীরটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া বলিতেছিল—"এ ঘরে তুই কে'রে? এর মধ্যে কি তোকে মানায়?"

নরেশ ডাকিলেন, "কিরে, কেমন আছিস্?" চমকিয়া চোক চাহিতেই দুজনকার চোকেই দুরকমে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। নরেশচন্দ্রের মনে প্রচুরতর করুণার সহিত আর যে ভাবটা অর্দ্ধ জাগ্রত হইল, সেটাকে ঈষৎ ঘৃণা ব্যতীত আর কি বলা যায়? ভিখারীর একটীমাত্র দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন নেত্রতারকায় নরেশের সুসজ্জমূর্ত্তি কৃতজ্ঞতার ও বিস্ময়ের আলোক সম্পাত করিয়াছিল।

ভিখারীর মুখে ও সর্ব্বদেহে বসন্তের নিষ্ঠুর ক্ষত চিহ্ন। মুখের দক্ষিণ অংশ, দক্ষিণ নেত্র, ললাটার্দ্ধ এবং গণ্ডের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ঐ অংশটা কোনরূপে অগ্নিদগ্ধ হইয়া থাকিবে। জীবিত মনুষ্যের মধ্যে এমন দুরবস্থা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু—কিন্তু ওই সর্ব্বহারার বিদগ্ধ মুখমণ্ডলে আরও কি কিছু দেখা যায় না? যায়। যাহা দেখা যায় বুঝি সে দেখাই আরও দুঃসহ! তাহা এই কথা ঘোষণা করিয়া বলে, এ ব্যক্তির চিরদিন এ অবস্থা ছিল না! একদিন সে মানুষের মধ্যে—সুপুরুষের মধ্যেই গণ্য ছিল। সেই সকরুণ কাহিনী দগ্ধ উপবন তুল্য মুখখানার আশে পাশে ব্যথিত ইঙ্গিতে পরিস্ফুট হইতেছে। যে একটী চক্ষু আজও বর্ত্তমান সে সত্যই বিশাল এবং বুদ্ধিব্যঞ্জক। মস্তকের বিরল কেশ আজও কি কুঞ্চিত! দেহ যে একদিন সুস্পষ্ট এবং দীর্ঘায়ত ছিল, আজও তার করুণ ইতিহাস জর্জ্জরিত দেহে সুব্যক্ত। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরিতে

জগতের অত্যুৎকৃষ্ট চারুশিল্পের ধ্বংসাবশেষ চোখে দেখিলে দর্শকের সমস্ত প্রাণটা মথিত করিয়া চক্ষে যেমন স্বতঃই জল আনে, বিধাতার এই উচ্চাদর্শে গঠিত মূর্ত্তির পরিণাম ফল দর্শনেও তেমনই করিয়া প্রাণ কাঁদে। নরেশচন্দ্রের কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। মনে হইল, আজ যে অবস্থার মধ্যে এরে দেখিতেছেন, এর প্রকৃত অবস্থা এ নয়! কোন আত্মবিস্মৃতির ফলে, কোন অজানিত দুর্ব্বাসাজাতীয়ের অভিশাপে, দেবদেহ ছাড়িয়া এ নক্রদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে! বয়সই বা কি? তাঁর চেয়ে কিছু কম হওয়াও বিচিত্র নয়। সহানুভূতি ও করুণায় বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বল তো।"

লোকটী একটু চিন্তিতভাবে নীরব রহিল, পরে একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল, "নিরঞ্জন।"

"নিরঞ্জন—কি? তোমরা?"

লোকটী আবার ভাবিল ও কহিল, "বৈদ্য—দাশগুপ্ত।"

"তোমার অবস্থা মনে হয় যেন চিরদিন এরকম ছিল না।"

নিরঞ্জন একটু উত্তেজনার সহিত, ঈষৎ ভীতির সঙ্গে, উপকারকের স্নেহ-মণ্ডিত মুখের দিকে চকিত হইয়া চাহিল, ত্রস্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "না না, ওসব কিছু অনুমান করতে যাবেন না। আমি ভিখারী—আমার ভাল দিন—ওঃ! না না—সে এ জন্মের নয়।"

নরেশ আর কিছু বলিলেন না। ইহার এই দগ্ধমরুর মত ভয়াবহ জীবনের মধ্যে যে তেমনই ভীষণ কোন একটা রহস্য নিহিত আছে, ইহা যেন তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন। হয়ত কোন দৈব বিড়ম্বনা, হয়ত কোন হত্যাকাণ্ড, হয়ত রাজনৈতিক কোন কিছু—হ্যাঁ, সেটাও তো আদৌ বিচিত্র নয়। নাইট্রিক অ্যাসিড, পিকরিক অ্যাসিডের পরিণাম

—থাক এসব অনুমানে কাজ কি। যাই হোক, এ ভদ্রসন্তান, অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত—দৈবক্রমে তাঁর দ্বারস্থ, থাক দুটো দিন এই আশ্রয়ে, কাজ কি হাসপাতালে পাঠাইয়া। ডাক্তার তো বলিল, শরীরে এর রোগ কিছুই নাই, সকল রোগের মূল কারণ অনাহার, তারই জন্য এর এই অবস্থা। আহা, একটু সামলাইয়া লউক। চাহিয়া দেখিলেন, ক্লান্তিভরে নিরঞ্জন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বকুলবনের বাতাসে বিভোল পরাণ বুঝি
উতল পাগল ফিরিছে ব্যাকুল প্রিয়েরে খুঁজি।
অন্তরে তার জাগিছে সে কোন পুরানো স্মৃতি
ফিরায়ে সে চায় কাতর হিয়ায় হারাণো প্রীতি।
—সায়াহ্নিকা (প্রভাময়ী মিত্র)

কয়েকদিন নিরঞ্জন শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল। পারিবারিক চিকিৎসক যথারীতি দর্শন দিয়া যেমন গৃহস্বামী, গৃহস্বামিনী এবং তাঁদের পরিজন-বর্গের শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অকারণ জেরা করিয়া যান, সেই রূপ যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ দর্শন দিয়া ইহার ঘরটাকেও পায়ের ধূলায় বঞ্চিত করেন না। প্রথম দু'একদিন তেমন মন দিতে পারেন নাই এবং দীনহীনের একশেষ ভিক্ষুকটাকে হাসপাতালে পাঠানর জন্যও তর্কাতর্কি করিয়াছিলেন কিন্তু গৃহকর্ত্তার রুচি প্রবৃত্তি অনুযায়ী সে চেষ্টা ছাড়িয়া এক্ষণে টনিকের ব্যবস্থা দিয়াছেন। দুবেলা আসিয়া "কিরে একটু বল পাচ্ছিস্? আচ্ছা, ওষুধটা যত্ন করে খেয়ে যা'তো, দেখ্‌বি কি রকম কাজ করে। একেবারে এক্স-সেলেণ্ট!"—ইত্যাদি ভাল কথা বলিয়া আপ্যায়িত করিতেও ত্রুটি করেন না।

ডাক্তারবাবুর এমন অসাধারণ ঔষধ সেবনেও যে সে হতভাগা সারিয়া উঠিতে বিলম্ব করিয়া রাজবাড়ীর ভৃত্যবর্গের গলগ্রহ হইয়া রহিল, সে যে কেবল তাহার জুয়াচুরি বুদ্ধিরই খেলা, ইহাতে, বামুনঠাকুর, পেঁচোর মা বা হারাধন খানসামা—এদের সর্ব্ব বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও এবিষয়ে—এদের সম্পূর্ণরূপেই ঐকমত্য ছিল। এদের নালিশ ফরিয়াদ শুনিতে শুনিতে এই দুর্ভাগ্য অতিথিটার প্রতি, এই বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী যিনি—তাঁর

মনটিও বেশ ভাল ছিল না। বাড়ীর এই গৃহিণীটির নাম পরিমল, বয়স তাঁর পঁচিশের উর্দ্ধে নয়; কাজেই সংসারের কুপোষ্য ইত্যাদির জন্য মাথা ঘামাইয়া, সময় নষ্ট করা তাঁর ভাল লাগার সম্ভব কম। তবে দরিদ্রের প্রতি কোন অযথা বিদ্বেষ তাঁর নাই, সেজন্য অশক্ত ভিখারীটাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবারও সঙ্কল্প দেখা দেয় নাই, কিন্তু তিনিই বা কি করিবেন?—বামুন ঠাকুরের দল যখন তখন ভিড় করিয়া রুষ্ট অসন্তোষের সহিত সমস্বরে গলা ছাড়িয়া জানাইয়া যায়, "এমন করিয়া তাদের পরে অবিচার হইতে থাকিলে তাহারা তেমন চাকরীর মুখে 'নুড়া' জ্বালিয়া দিয়া যেদিকে দুচক্ষু যায় সেই দিকেই চলিয়া যাইবে। 'গতর' সুখে থাকিলে চাকরীর নাকি এ সহরে অভাব আছে? তারা রাজবাড়ী জানিয়া কাজে বাহাল হইয়াছিল, ভিখারীর সেবা করা তাদের পেশা নয়। তা'ও কি একটা সোজাসুজি ভিখারী! না আছে তার না'খার চাড়, না আছে তার খাবার চাড়। তুই ভিখারী মানুষ তোর আবার অত কেন? যা' পেলি হাঁসফাঁস ক'রে গিলে কুটে নিয়ে বর্ত্তে যা; তা নয়, পাতের ভাত পাতেই পড়ে থাকলো, উর্দ্ধমুখে হাঁ করে ঘরের কড়িকাঠপানেই তাকিয়ে রইলেন, আবার মনে পড়িয়ে দিলে তবে খাবেন। অত কার গরজ? ওঁর কত কালেরই মা বোন পাশে বসে বসে খাওয়াচ্ছে কি না?"

পেঁচোর মার গায়ের জ্বালাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রথম যে দিন সে নিরঞ্জনকে দিয়া উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করাইয়া লয়, তখন নিরঞ্জনের শরীর একান্ত দুর্ব্বল থাকা প্রযুক্ত সে বাসন মাজিয়া উঠিয়াই পতনোন্মুখ হয়। কপালক্রমে কিনা ঠিক সেই সময়টিতেই নরেশচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটিল! রাজাবাবুর ঘৃণা পিত্ত ত নাই! ওই কদাকার মুখপোড়া-হনুটাকে নিজে হাতে ধরিয়া ফেলিয়া, এতটুকু বিবেচনা না করিয়াই, নিরপরাধিনী পেঁচোর মাকে 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' কি বকুনিটাই না বকিলেন! শেষে

হুকুম দিয়া বলিলেন, ঐ পোড়ারমুখোটা যখন জাতে বদ্দি, তখন ওর এঁটোকাঁটা কায়েত বাড়ীর দাসীচাকরে কিসের জন্যই বা ছুঁতে না পারবে? ও গুরুঠাকুরের মতন এবার থেকে বসে বসে গিল্‌বে, আর ওর পাত কুড়োবে এই ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গাকুলো কাঙ্গালের কাঙ্গাল পেঁচোর মা।—বিচারটা দশে পাঁচে দেখুক একবার!

এই সব নানা কথা শুনিতে শুনিতে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া একদিন সদ্য নালিশের যন্ত্রণার পরক্ষণেই স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া পরিমল তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "অনেক দিন ত হয়ে গেল, এতদিন অবশ্যই গায়ে জোর পেয়েছে, এইবার ওটাকে যেতে বল্লেই হয় না?"

নরেশ প্রথমতঃ কথাটার অর্থবোধ করিতে না পারায় জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়াই সহসা ভাবার্থ বুঝিয়া কহিয়া উঠিলেন, "নিরঞ্জনের কথা বল্‌চো?"

পরিমল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছল্যস্বরে উত্তর করিল, "কি রঞ্জন তা জানিনে, আমি ওই হাড়-জ্বালানে ভিখিরিটার কথা বলছিলুম। ওর জ্বালায় বাড়ীর সব ঝি চাকরগুলো জ্বালাতন হয়ে ছেড়ে যেতে বসেছে।"

নরেশচন্দ্রের নেত্রে বিরক্তির ঘন ছায়া পড়িল। অসন্তোষের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তাদের কি পাকাধানে ও মই দিচ্চে?"

পরিমলও কিছু উষ্ণভাবে কহিল, "মই দিচ্চে কি, কি করচে, তা তারাই জানে! মোট কথা, তারা বলচে যে ও যদি থাকে, তবে ও-ই থাক্‌, আমরা তাহলে কেউ এ বাড়ীতে চাকরী করতে থাকবো না। সেই কি ভাল, যে খামকা একটা ভূতুড়ে লোকের জন্য বাড়ী শুদ্ধ সব ঝি চাকর বামুনগুলো ছেড়ে যাবে?"

নরেশচন্দ্র প্রথমতঃ রাগ করিয়া বলিলেন, "যায় যাক্‌! অমন সব হিংসুটে পাজীলোক বাড়ী ছাড়লেই হাড়ে বাতাস লাগবে।"

পরক্ষণেই সেই বিদ্রোহী পরিজনবর্গের অগ্রবর্ত্তিনী-স্বরূপা গৃহিণীকে

—"বেশ তবে ওকে নিয়েই থেকো"—বলিয়া প্রস্থানোন্মুখী দেখিয়া বিরক্তি ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, ও তাঁর চাবিশুদ্ধ আঁচলখানা ধরিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে কহিলেন, "একি! তারা যায় যাবে, তুমি যাচ্চ কি জন্যে? তুমি ত আর পেঁচোর মা নও, যে তোমায় তার এঁটো মাজতে হয়—হারাধন নও যে তার বিছানা পেতে দাও,—তবে, তোমার অত চটবার কারণটা কি বলতো?"

বস্তুতঃ হিসাব মত চটিবার কোন কারণই ছিল না। কথাটা কানে গিয়া তাই পরিমলকে ঈষৎ লজ্জা দিল। দেখাইবার মত কোন যুক্তি না পাইয়া শুধু একটুখানি অপ্রতিভের মৃদুহাস্য হাসিয়া সবেগে কহিয়া উঠিল,"ধেৎ,—আমি কেন চটবো। আমার আবার এতে কি! তবে অত-লোক সর্ব্বদাই ওর জন্য চটে রয়েচে, যখন তখন চলে যেতে চায়, তাই, না হলে—"

নরেশ কহিলেন, "দাও না চলে যেতে, কেমন যায় দেখ না। কক্ষনো যাবে না; সে আমি হলপ করে বল্‌তে পারি। এমন দিল-দরিয়া গিন্নি ওরা পাবে কোথায়? একটা গরীব না খেটে দুবেলা দু মুটো ভাত খাচ্চে; এইটেই হয়েছে ওদের সবাকার চক্ষুশূল!—যারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত, তারাই যেন বেশী করে পরকে অভাবের মধ্যে দেখতে ভালবাসে। আমার ভদ্রলোক বন্ধুরা—যাক্ ওরকম হয়েই থাকে—।"

শুনিয়া পরিমলের মনে লজ্জার তীক্ষ্ণ কণ্টক বিঁধিয়া উঠিল। ছি ছি, সেও তো প্রায় এই মমতাহীন ভদ্রাভদ্র লোকেদের সহিত একজোট হইয়াছিল! স্বামীর দয়ার্দ্রতার সমুচিত গৌরব করা দূরে থাক, উল্টাইয়া তাঁকে ভালকাজে বাধা দিতে গিয়াছে, স্বামী বাধা মানেন নাই বলিয়া নিজেকে হতমান বোধে অভিমান করিয়াছে। এমন নীচু মন তার নিজের ইতিহাস-মন হইতে মুছিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? যদি তার এই উচ্চহৃদয়

স্বামীর মধ্যে এত বড় দরিদ্র-প্রীতি না থাকিত, তবে আজকের এই রাণী পরিমলকুমারী মিত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যমণ্ডিতা হইয়া সহরের বুকের মাঝখানে হীরকদ্যুতির মতই ঝলমল করিতেছেন, এ কোথা হইতে হইত? আজ দরিদ্র ভিখারীর প্রতি স্বামীর অতটুকু সহৃদয়তাকে 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া নাক সিটকাইতেছে, আর যেদিন সেই ব্যক্তিই নিজের সামাজিক পদ-প্রতিষ্ঠা, রূপ যৌবন অতুল ঐশ্বর্য্য—তুচ্ছ করিয়া, ধনীনন্দিনীদের প্রত্যাখ্যানে ঠেলিয়া ফেলিয়া, এই ভিখারিণীকে নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেদিন তাঁর সেই অনন্যসাধারণ অদ্ভুত কার্য্যটাকে কতই না বাড়াবাড়ি বলিয়া কতলোকেই না ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল!—সেই কথা মনে করিতেই পরিমলের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। স্বামীর একেবারে কাছে ঘেঁসিয়া সলজ্জ অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "বেশ করেছ ওকে এনেছ! তুমি কার না কবে ভাল করো তা' ওরা যদি চলেই যায় যাগ্‌গে—আমি নিজে হাতে সব করবো।"

নরেশ ঋণী হইয়া স্ত্রীর মুখের উপর সস্মিত প্রীতনেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "এই তো মানুষের কথা! ভয় দেখিয়ে কেউ অন্যায় করিয়ে নে'বে কেন!"

অন্য একসময়ে পরিমল স্বামীকে কাছে পাইয়া যেন নিজের পূর্ব্বকৃত অবহেলা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই উঁহাকে একটুখানি খুসী করিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিরঞ্জন একটু সেরে উঠ্‌চে?"

নরেশ কহিলেন, "হাঁ অনেকটা, তবে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে কি না, শীঘ্র যে বেশ স্বাভাবিক হবে, সে আশা করা চলে না।"

পরিমল একটু সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল, "ওরা বলে ওর মুখটা নাকি পুড়ে গেছে? কি করে গেল—আহা!"

নরেশ কহিলেন, "কি করে গেল সে কথা একদিন জিজ্ঞাসা

করেছিলেম, দেখলেম, ওসব বিষয়ে কিছুই সে বল্‌তে চায় না। পূর্ব্বকথা কোন কিছু উঠে পড়্‌লে কষ্ট পায়, চুপ হয়ে যায়, আমিও জান্‌বার জন্য চেষ্টা করিনি। যাই হোক, কোন রকম ভয়ানক দৈব দুর্ঘটনা যে ওর উপর দিয়ে ঘটে গেছে, আর তার ফলেই যে ওর এই দশা, এটা নিঃসন্দেহ। লোকটাকে আজ আমরা যা দেখ্‌ছি ও ঠিক তা' নয়।"

পরিমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া উঠিল, "সে আবার কি?"

নরেশচন্দ্র ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "লোকটা বিদ্বান্‌ ছিল—'ছিল'ই বল্‌চি; তার কারণ, এখন ওর মাথাটা ঠিক সহজ অবস্থায় নেই।—বেশী দুর্ব্বলতা, কি বেশী শোক, রোগ, আতঙ্ক অথবা ঐ আগুনে বা অ্যাসিডে পোড়া—এই রকম কোন কিছুতে ওর শরীরের সঙ্গে ভিতরটাকেও ঠিক অমনি করেই পুড়িয়ে দিয়েছে। যেমন শরীরেরও কোন কোন অংশে পূর্ব্বেকার সৌন্দর্য্য, ভগ্নস্তূপের অন্তরালে অপূর্ব্ব শিল্প শোভার মত উঁকি মারচে—মনেরও সেই অবস্থা। বুঝতে পারি একটা সত্যকার ভাল লোক বিপন্ন হয়ে আমার দোরে এসেছে।"

পরিমল মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়া প্রকাশ্যে বলিল, "ওদের আমি বুঝিয়ে বলবো'খন, ও থাক।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পান্থ !
বড় শ্রান্ত
তুমি পথহারা, আকাশে উঠিছে তারা,
ঘনায়ে আসিছে ধীরে রাত্রি,
কোথা যাবি ও-অভাগা যাত্রী ?—
হেথা স্নিগ্ধ গৃহছায়, আয় ফিরে আয়,
উদ্‌ভ্রান্ত, পান্থ !
—সায়াহ্নিকা

এর পর হইতে নিরঞ্জনের একটু কপাল ফিরিল। কর্ত্তার প্রিয়পাত্র হওয়ার অপরাধে সে বেচারার ঔষধ, পথ্য, সেবা কিছুই সমুচিতরূপে জুটিত না, কর্ত্রীর সুদৃষ্টিতে, তাঁর খোঁজ খবর লওয়ার গুণে সে রাজ-ভৃত্যবর্গের হাত এড়াইয়া কিছু কিছু সত্য বস্তু লাভ করিতে থাকায় সহজেই শরীরে বল পাইতে লাগিল। এমন করিয়া কিছুদিন গেলে, একদিন নরেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া সে বিনীতভাবে তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বলিল, "এখন তো আমি সেরে উঠেছি, আজ্ঞা করেন তো এবার যাই।"

নরেশচন্দ্রের মুখে একটা সুগন্ধি সিগারে আগুন জলিতেছিল, সজোরে সেটাতে একটা টান দিয়া, ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মনের মধ্যে একটু উষ্মা জাগিয়াছিল, তাহা ঐ ত্রিপাদগ্রাসী গ্রহণ লাগার মত প্রভাহীন মুখখানার প্রতি চাহিতেই অন্তর্হিত হইল। তথাপি একটু কঠিনস্বরেই বাহির হইয়া গেল—"এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই ? কেন শুনি ?"

কথাটা বোধ হয় একটু বেশী কঠিন ঠেকিয়া থাকিবে, নিরঞ্জন যেন বেত্রাহতের মতই চম্‌কাইয়া এক পা পিছাইয়া গেল, স্বল্পরে ঈষৎ সামলাইয়া লইয়া যখন কিছু বলিতে গেল, ততক্ষণে নরেশচন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরের নীরসতা নিজেই লক্ষ্য করিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সেটা শোধরাইয়া লইলেন। সদয়কণ্ঠে কহিলেন, "আমার বাড়ীর চাকরগুলো বুঝি আবার লাগতে আরম্ভ করেচে? দেখছি আমি।"

নিরঞ্জন কহিল, "তাদের কোন দোষ নেই।"

নরেশ কহিলেন, "তবে কা'দের আছে?"

অপরাধীভাবে নিরঞ্জন পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলা দুষ্কর বুঝিয়াও বলিয়া ফেলিল, "চিরদিনই কি আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবো?"

নরেশ পুনশ্চ ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "না হলে কি করবে শুনি?"

কি করিবে? এ কথা কই নিরঞ্জন তো ভাবিয়া দেখে নাই। কি করিবে? কেমন করিয়া দিন চলিবে, এই যে অতি সহজ প্রশ্ন, সমস্ত পৃথিবীর লোক মনের মধ্যে যার তোলাপাড়া অহোরহই করিতেছে, এই লোক্‌টার মনের খাতার পাতা হইতে ঠিক ঐ কথাটাই যেন মুছিয়া গিয়াছে। এই সহজ প্রশ্নটাই সে মনের কাছে উত্থাপিত করিতে পারে না—অপরে করিলেও ভীত হয়। কিন্তু নরেশচন্দ্রের কথাটা বলিবার ভঙ্গীতে ও উদ্দেশ্যে সে আজ একটুখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, নিরুত্তরে মুখ নত করিয়া রহিল। যে কথার উত্তরের পুঁজি তার নাই, তার জন্য বৃথা চেষ্টা সে করিল না।

উহাকে নীরব দেখিয়া নরেশচন্দ্র একটু শ্লেষের ভাবে কহিলেন, "আবার সেই রাস্তার ধারে পড়ে মরণের প্রতীক্ষা করবে বোধ হয়?"

তারপর ইহাতেও উত্তর আদায় করিতে না পারিয়া একটু উত্তেজিত

বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, "পরের সাহায্য নিতে এতই যদি আপত্তি থাকে, তা'হলে একটা চাকরী করলেও তো পারো। 'গলগ্রহ' হ'বার দরকারই বা হয় কেন?"

নিরঞ্জন এবার কথা কহিল, বলিল, "দু' একবার চাকরী করেছিলেম, —মধ্যে মধ্যে মাথার ঠিক থাকে না, শুনেছি একবার সেই অবস্থায় যে আফিসে কাজ করতেম তার কি কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলি, তারা বিদায় করে দেয়। আরও একবার একটি উকিলের মুহুরীর কাজ পেয়েছিলাম; কিসে নষ্ট হয়—মনে নেই। হয়ত বেশী অসুখ করেছিল, যখন থেকে মনে আছে তখন আমি হাসপাতালে।

এই উত্তর পাইয়া নরেশ লজ্জিত হইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, তারপর হাত দিয়া অদূরবর্ত্তী বাগানের একখানা বেঞ্চ দেখাইয়া বলিলেন, "এসো, ঐখানে বসে একটু কথা কওয়া যাক্।"—বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে আসন লইয়া পুরাতন আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন, "আচ্ছা শেষ চাকরী যে করেছিলে সে কতদিন আগে?"

নিরঞ্জন মনে মনে হিসাব করিয়া উত্তর দিল, "মনে হয় যেন এক বৎসর পাঁচ মাস পূর্ব্বে।"

"এই এক বৎসর পাঁচ মাসের মধ্যে আর কোন কিছুই করোনি?"

নিরঞ্জন নিরুত্তর রহিল। পরে কহিল, "পাগলা গারদের হাসপাতালে মাস এগার থাকার পর সেখান থেকে বেরিয়ে চেষ্টা অনেক করেছিলেম, আমার এই চেহারা দেখে কেউ চাকরী দিতে চায় না। অনেকে ভাবে হয়ত বোমার ম্যানুফ্যাক্‌চারার, পলাতক আসামী, পুলিসের চর ঘুরছে হয়ত পিছন পিছন।"

নরেশচন্দ্রও নিজেও এ সন্দেহমুক্ত নহেন তাই সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন;

"অনুমানটা কি মিথ্যা? কিন্তু, না থাক, উত্তর আমি চাইনি—তুমি থাকো চাকরী আমি তোমায় জুটিয়ে দেবো।"

নিরঞ্জন যুক্তকর নিজের ললাটে স্পর্শ করিয়া গাঢ়স্বরে উত্তর করিল, "আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ তাই যাওয়ার কথা তুলেছিলেম। আপনার সেবা চিরদিন ধরে আমার আপনা হ'তেই করতে চাওয়া উচিত ছিল।"

উত্তর শুনিয়া নরেশচন্দ্র হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর শিশুসুলভ উচ্চ হাস্যে ঝুম্‌কালতার বিতান মধ্যে যে পালিত হরিণটা কচি ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিবিষ্ট ছিল, সেটা চকিত হইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "দেখ নিরঞ্জন! অনেক গ্রাজুয়েট দোকানদার, গ্রাজুয়েট কুলির কথা শোনা গেছে;—কিন্তু গ্রাজুয়েট-সেবক নিয়ে আমি কি কর্ব্বো বলতো? সেবা-টেবা নয়, তার চেয়েও একটা শক্ত কাজে আমি তোমায় জুড়ে দেবো মনে করেছি। তখন কিন্তু আমায় গাল দিও না, দেখো—"

নিরঞ্জনের স্বাভাবিক ম্লান ও বিমর্ষ মুখে ঈষৎ হাসির তড়িৎ চমকিয়া গেল। সে কহিল, "আমায় আপনি যা' করাবেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।"

নরেশচন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া কহিলেন, "বেশ,—দেখা যাবে, সে বড় বিষম ঠাঁই!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধনবৈভব, হায় গো সে সব চক্রের মত ঘোরে ;
কখন তোমার, কখন আমার স্থির নয় কারো ঘরে।
—তীর্থরেণু

নিরঞ্জন এ বাড়ীতে থাকিয়া গেল। শুধু থাকাই নয়—বাড়ীর আশ্রিত হিসাবে নহে—কর্ম্মচারী হিসাবে রহিল সে সংবাদ উহ্য রহিল না। তা' এ সমাচারটা গোপন না থাকাই শুভফলপ্রদ হইয়াছিল। যতক্ষণ কপর্দ্দকহীন ভিখারী নিরঞ্জন এই সুবিপুল রাজবাটীর একটি প্রান্তে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, ততক্ষণই তার ঔষধপথ্য সেবার সর্ব্ববিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পাইয়াছে। কিন্তু এখন তো আর সেই দীনাতিদীনাবস্থা নিরঞ্জনের থাকিল না, তাই সংসার ক্ষেত্রেও তার মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে স্থিতি লাভও করিল। এখন হইতে মাঝে মাঝে বখশিষ চাহিলে পাওয়া যাইবে। আবশ্যক অনাবশ্যক কর্জ্জ লইয়া সুদ তো নয়, শোধও না দিলে চলিতে পারে, ইত্যাদিতে অনেক সুযোগ পাওয়া অসম্ভব বা অসঙ্গতই বা এমন কি? বামুন ঠাকুরের দল প্রথম এই খবরটা শুনিয়া দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষে নাসিকা অনেক উচ্চে তুলিয়া প্রচলিত ছড়া কাটিল—'যত ছিল নেড়া-বুনে, সবাই হলো কীর্ত্তুনে, কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালে খন্তাল।'—ইত্যাদি বলিয়া ব্যঙ্গহাস্যে রান্না মহলটা ফাটাইতে চাহিলেও—পূর্ব্বোক্তযুক্তিগুলি মাথায় ঢুকিয়া শীঘ্রই তাদের গম্ভীর করিয়া আনিল।

হারাধন বলিল, "তা যাই বল, আর যাই কও সর্ব্বঠাকুর, মুখপোড়াটা এদিকে লোকটা ভাল, ওটাকে হাতে রাখতে পারলে মন্দ হ'তো না।"

অমনি সকলকারই মাথায় ফন্দিটা খাটিয়া গেল। সর্ব্বঠাকুর হারাধনের সহিত সম্পূর্ণরূপে একমত হইল, "ঠিক বলেছিস্‌রে হারু,

পোড়ামুখোটা হাঁদা আছে, কে জানে ওটার অমন পাতা-চাপা কপাল ! ভিক্ষে করতে এসে যে সভা-পণ্ডিত হয়ে বসবে তা'কি ছাই জানি, তা'লে কি গোড়া থেকে তুচ্ছু করি ? আহারে ! বড্ড চুকটাই হয়ে গেছে !

হারাধন মুখ সিটকাইয়া কহিল, "বামনাই বুদ্ধি এম্‌নিই বটেক ! তুচ্ছু করেচি তো হয়েচে কি ? আজ থেকে অ-তুচ্ছু করতে লেগে যাওনা কেনে ! উয়ার যদি অতই হোঁস থাকবেক, তবে কি তিনটে বেরালে পাতের থেকে ভাগ বসায় ? ছ্যাখচোনা লোকটা টুকচে আলাভোলা বটেক !"

সর্ব্বঠাকুর নরসুন্দর-নন্দনের যুক্তিটাকে সমীচীন বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তে সায় দিল, "তা বটে ! তা হ্যাঁরে হারু, ও মানুষকে রাজাবাবু কি চাকরী দেবে বল্ দেখি ? ওই তো রূপ আর ওই তো বুদ্ধি !"

হারাধনের পূর্ব্বেই বাবুর খাস খানসামা ইহাদের চেয়ে পুরাতন ভৃত্য সাতকড়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সর্ব্বঠাকুরের প্রশ্ন ও মন্তব্য শুনিয়া ব্যঙ্গের সহিত উত্তর দিল, "আমাদের রাজা-সাহেবের ভাত পেটে পড়লে, অনেকেরই পোড়া রূপ তাজা হয়ে উঠে রে ! সে তোরা না দেখে থাকিস্ সাতকড়ের সব দেখা আছে ! অনেক জানোয়ার আছে, যারা উঁচুতে উঠ্‌তে পেলেও, নজর উপরে উঠতে চায় না।—জানিস্ না আমাদের মুনিবেরও সেই দশা !"

কথাটার মধ্যে যে একটা বিশেষরূপ তীব্র ইঙ্গিত নিহিত ছিল সে তত্ত্বের সন্ধান এ বাড়ীর চাকর দাসীদের কাহারও অজ্ঞাত নয়, তা' সে যতই নূতন হোক না কেন। সেই কথাটা স্মরণ করিয়া সকলেই বিদ্রূপের হাসি হাসিল।

রান্নাঘরের ঝি পেঁচোর মা বলিল, "ঠিক বলেছিসরে সেতো ! একটা বাক্যির মতন বাক্যি কয়েছিস্‌রে ! খুব সত্যি কথা ! বড়লোক তুমি,

বড়লোকের মতন রুচি পিরবিত্তি হয় না কেনে? দেখেওচি আর শুনেওচি কত বড় বড় লোক রূপসী-রূপসী মেয়ে নিয়ে দোরে হত্যো দিয়েছে, সে সব চক্ষের কোণাটা দিয়েও চেয়ে দেখলো না, কোথাকার একটা বাইজী না কি, মোছলমান না য়িহুদী মাগী; তাকেই মাথার মণি করে রাখলো। তার কোঠা বালাখানা, সোনাদানা, গাড়ী, পাল্কী, কি ছিষ্টি! তা' সেও নয় বুঝলুম বাপু, বড় লোকের ছেলেদের ওতে দোষ নেই! ভগমান ভোগ করতে দিয়েচেন, করবে না?—তা হয় তাই নিয়েই থাক, নৈলে একটা জমিদার রাজা-টাজার ঘর থেকে বউ নিয়ে আয়, পাঁচজনে দেখে ধন্যি ধন্যি করুক। পাঁচটা তত্ত তাবাস আস্থক-যাক্, কুটুম্বসাক্ষেৎ আনাগোনা করুক। আমরাও গরীব দুঃখী লোক—দুটো উপরির পেত্যেশ করেই না রাজবাড়ীতে এয়েছি, পাই না হয় টাকাটা সিকেটা! হঠাৎ কোথাকার একটা পথে-কুড়ুনো কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে ধরে এনে কি না তাকেই এক্কেবারে রাজ্যিপাটে বসিয়ে দিলে। ঘুঁটেকুড়ুনী হলেন পাটরাণী! কি কাণ্ড মা!"

সকলেই এই সুমন্তব্যে মুখ মুচকিয়া হাসিল।

সাতকড়ি হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুই আবার ক্কা'ওর দেখলি কি! যে অমন করে গালে হাত দিয়ে বস্‌লি? সে যদি কেউ দেখে থাকে সে এই ঘোষের পো সাতকড়ি।—বলি, তাহলে শোন কথা;—সে এক অজ পাড়াগাঁ, চারিদিকে তার জঙ্গল আর জঙ্গল, দিনের বেলার সেথাকার জঙ্গলে হুয়া হুয়া করে শেয়াল ডাকে, রেতের বেলায় প্রাণটী হাতে নিয়ে পিদীমটী সামনে করে সারারাত জেগে কাটাই, কি, না কখন বাঘ এসে ঘাড়ের রক্তটুকু না চুমুক মেরে খেয়ে যায়! একতাল্লা কাচারী বাড়ীর ভাঙ্গা চোরা দরজাগুলো ভররাত নেকড়ের বাচ্চারা এসে ঢক্ ঢক্ ঢক্ টক্ নাড়া দিয়ে যাচ্চো বাবাঃ! সে কি দেশ, না সে দেশে কোন ভদ্দর

নোকের ছেলে পা দেয়? তা আমাদের বাবুর সকলি কি না বিপরীত কাণ্ড!—ওঁয়ার বাপ পিতেমোদেরও বোধ করি ওঁয়ারই মতন রুচি পিরবিত্তি ছিল, তাই সেই দেশে গেছলেন তারা জমিদারী কিনতে!— আই বা বল্‌বো কি,—সেখানের একটা বুড় প্রজার মুখেই শোনা,—ওঁয়ার ঠাকুদ্দা নাকি বড্ড গরীব ছিল, ওই অঞ্চলেরই কোন্ এক বড় লোকের বাড়ী নাকি গোমস্তাগিরি করে খেতো। তারপর কি রকম করে তাদের জমিদারী লাটে ওঠে আর বেনামীতে ও নিজেই জলের দামে কিনে নেয়। এত বড় অধম্মে লোক ওরা!"

শ্রোতৃবৃন্দ মহোৎসাহে সাতকড়ির বর্ণিত মনিব-কুলের কুৎসা শুনিতেছিল। শ্রোতাদলের মধ্য হইতে পেঁচোর মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "তা' হ্যাঁগা, ওদের সেই জমিদার-মুনিবের কি হলো গা? তারা বোধ করি খুব গরীব হয়ে গেল? তাদের এখন কে আছে গা?"

"শোন ন্যাকা মাগীর ন্যাকা কথা! তা'দের কে আছে, তারা কি খায়, গাছতলায় শুতো কি কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছিলো—সে-সব ফিরিস্তি নাকি আমার কাছে তারা দাখিল করে দিয়ে গেছে! আমি তার কি জানি। গরীব তারা অব্বিশ্যি হলো বই কি! তবে খেতে না পেয়ে মরে গেল, কি কম-সম খেয়ে জ্যান্ত রইলো, সে ইতিহাসের পুঁথিটে আমার পড়া নেই। এদের কথাটাই সেই 'শেয়াল রাজার' দেশ থেকে শুনে এসেছিলুম, তাই তোদের কাছে বল্লুম, দেখিস্ যেন পাঁচকান না হয়! যে তোরা কাণপাতলা নোক বাপু!—ওই যে ছোট দিকের একটা টান আছে, তোরা বল্‌ছিলি না,—সেটা এলো কোত্থেকে, সেই কথাটাই তোদের শুনিয়ে দিলুম। কিন্তু খবরদার পাঁচকান যেন না হয়!"

সুর, চাহনির মধ্য দিয়া মনিব বংশের হীন রুচি সম্বন্ধীয় অনেকখানি ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়া হাস্য-কৌতুকের বেগ কমিলে সাতকড়ি তাদের

শুনিবার এবং নিজের বলিবার আগ্রহে কথিত কাহিনীর অ-কথিত অংশটা পুনরারম্ভ করিল,—

"হ্যাঁ, তারপর, হ্যাঁ, দেখগে, কি বলেগে! বলছিলুম কি—সেই তো দেশ, তা' সে অঞ্চলে ওর ঠাকুদ্দা যখন জমিদার হয়, তখন অবিশ্যি ওদের আমদানি নাকি এর সিকির সিকিও ছিল না ও দিকটা তখন আরও বাদাড় ছিল তো, যাকে বলে সেই, 'অজাগরবিজ' বন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলা ছিল, খানিকটে নদীর গর্ভে ডুবেই ছিল। ওদের কপালগুনো কি কম জোরালো, হঠাৎ দুটো নদীর স্রোত ফিরে গেল—একটা বেঁকে এসে ওদের জমীদারীর পাশ দিয়ে বয়ে গেল, তা'তে নাকি একদিকে ঢের আবাদী জমির সৃষ্টি হলো, আর একদিকে ভারী ভারী সেগুন চালানের সুবিধে হয়ে গেল। আর একটা নদীর জন্যেও কি নাকি সব সুবিধে পাওয়ায় জায়গায় জায়গায় বন আবাদ করে লোক বসতি ক'রে, যেখানে দু'হাজার ছিল, সেখানে ছত্রিশ হাজার টাকা আয় দাঁড়ালো। এমনি করে আরও কত বেড়ে উঠেচে তা' কে জানে? বেশীর ভাগ জমিদারের জমিদারীই নাকি এই করে পত্তন হয়েচে। শুনেচি ওদের মধ্যের কেউ কেউ নাকি ডাকাত পুষতো, কেউ মনিব ঠকিয়েচে, কেউ সরকারকে বড় বড় রাজত্ব-লুঠের সাহায্য করে নিজেরা ফুলে লাল হয়ে গেছে! তা' এদেরই শুধু দুষ্‌লে হবে কেন? আবার সেদিন সরকার মশাই বল্‌ছেল যে, এখন আবার অনেকে পুলিশে গোয়েন্দাগিরি করে, খুনীর হাতে খুন হয়ে, বউ ছেলেকে জমিদার করেও নাকি দিয়ে যাচ্চে! সংসারে কতই আছে।"

ইতিমধ্যে বাসনমাজা ঝি মোহিনীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, সে মুগ্ধ হইয়া মন্তব্য করিল, "আহা! সাতকড়ি আমাদের কত জানে!"

পেঁচোরমা আকস্মিক রসভঙ্গে মহা বিরক্ত হইয়া পেঁচার মত চোক

তেমনি করিয়া পাকাইয়া মোহিনীকে ধমক দিল, "ভদ্দর লোকের সঙ্গে সঙ্গে চারটে কাল দেশ বিদেশে ঘুরচে, না জান্‌বেই বা কেন্ না? নে' দাদা সাতু! তুই ভাই, বলে যা, বেশ লাগচে শুনতে। তারপর?—"

মোহিনী বিরক্ত হইয়া ঝঙ্কার তুলিল, "আ গেল যা, একটা কথার কথা মাত্তর কয়িচি, না, মাগি অমনি আগুনখাকীর মতন তেড়ে মারতে এলো! বলি, সাতকড়িকে বলেচি তো তোর অত গায়ের জ্বালা কেন বল্‌তো? কেন তোর একলার সাতকড়ি নাকি যে কারুর একটা ভালমন্দ কথা কইবার যো নেই, অমনি গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়?"

তখন আর যায় কোথা? রণহুঙ্কার দিয়া প্রায় "যুদ্ধং দেহি" ভাবে ফিরিয়া পেঁচোর মা দাঁত কিড়মিড় করিয়া উঠিল, "আ মর মাগি! গতরের মাথা খেয়ে গায়ে পড়ে এলো লাগতে! আয় তবে দেখি কতবড় তোর মুখ।"

অদূর হইতে একটা হাঁক আসিল, "সাতকড়ি! রাজাবাবু তোমায় ডাকচেন।"

নিতান্ত ভাল মানুষের মত মুখটী করিয়া সাতকড়িও হাঁকিয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে এই যাচ্চি—" কোন্দল-পরায়ণাদের দিকে চাহিয়া দুঃখিতভাবে কহিয়া গেল, "নিজেদের দোষেই তোরা গল্পটা শেষ কর্‌তে দিলিনি। না' দি'গে, মরগে, দুটাতে খাওয়া খাওয়ি করে। আর তো কোনদিন বল্‌বো না।"

এই বলিয়া সে প্রস্থিত হইল।

পিছন হইতে কোপরুদ্ধঝঙ্কারে মোহিনী চেঁচাইয়া কহিল, "বল্‌বিনি তো বল্‌বিনি সেই ভয়ে আমি মরে রইলুম আর কি! কি তোর এমন মহাভারতের ব্যাখ্যানা, যে, কানে না গেলে নরকে পচে মরে থাকবো? খোসামোদ যে করতে জানে সে-ই ভাল করে করবে'খন। খোসামোদ

যদি এস্‌তো, তো তোর কেনে, তোর মুনিবেরই করতুম! না শীত, না গ্রীষ্মী বাসন মেজে মরতুম না।”

পেঁচোর মা দুই পাকান চোখে মোহিনীকে ভস্ম করিবার মত আগুন ভরিয়া খোঁপাখোলা এলোচুল আঁটিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দাঁত কিড়মিড় করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল—“দেখ্‌ মোহী আবাগী! অমন করে ভাল মানুষদের পেছনে নাগিস্‌নে বল্‌চি! কেন, আমি কি তোর বুকে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছি, যে যখন তখন তুই আমায় ঠোক্কর মেরে কথা কইতে আসিস্‌?

নিরঞ্জনের চাকরী হইয়াছে সে খবর বাড়ীর বাসিন্দারা এবং যারা বাড়ীতে আসা যাওয়া করিত সকলেই জানিল বটে; কিন্তু কি চাকরী তার হইল, সে খবরে যেমন পাঁচজনে, তেমনি নিরঞ্জন নিজেও অজ্ঞ রহিল। প্রায় দিন পনেরই এই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া কাটিল। চাকরী পাইয়া নিরঞ্জনের মনটা একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু ফলে দেখা গেল, চাকরীর মধ্যে যথাপূর্ব্বই সেই আশ্রয়দাতার বাড়ীর নীচের তলার একটী এই বিশেষ ঘরে নির্দ্দিষ্ট বিছানায় পড়িয়া অফুরন্ত দুঃখময় চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া অথবা সেই ঘরের কড়িকাঠ কয়খানার হিসাব রাখা—এ ভিন্ন কর্ম্মজীবনের কোন সফলতাই দেখা দিল না। আরও দুইচারি দিন অপেক্ষা করিয়া একদিন নরেশচন্দ্রের নাগাল পাইয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, “আমায় তো কোন কাজ দেওয়া হ’ল না?”

নরেশ কি কাজে তাঁর স্বভাবজাত অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন; তাহাতে মগ্ন থাকিয়া ত্বরিত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “ব্যস্ত হয়ো না, দুদিনেই কর্ম্ম-স্রোতে ভাঁটা পড়ে যাবে না, ঠিক থাকবে।”

নিরঞ্জন কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিতে গিয়া আবার বন্ধ করিয়া ফেলিল। কি জানি বেশী পীড়ন করিয়া কাজ আদায় করিতে গেলে

হয়ত সেটা আদায় হওয়া অধিকতর দুর্ঘট হইয়া পড়াও বিচিত্র নয়! বাবুর যে মেজাজের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে আর যতই ভাল জিনিষ থাক, খেয়ালের খেলাও বেশ আছে সেটাও নেহাৎ অস্পষ্ট নয়। কেহ, জোর করিয়া 'হাঁ' বলিলে তাঁকে জিদের সঙ্গে 'না' বলিতে বাধ্য করা হয়'। অতএব আগ্রহের চাইতে অনাগ্রহে কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

ফিরিতেছিল, নরেশ ডাকিলেন, "ওহে নিরঞ্জন! শোন, শোন—"

নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিয়া নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশ একতাড়া কাগজ দেখাইয়া কহিলেন, "আমার এই পিঁপড়ের ঠ্যাং লেখা-গুলো বুঝে নিয়ে এর একটা "ফেয়ার কপি" করতে পারবে?"

হারানিধি কুড়াইয়া পাইলে মানুষের মুখের যে ভাব হয়, তেমনি ধারা উৎফুল্লমুখে নিরঞ্জন ছোঁ মারিয়াই যেন নরেশের হাত হইতে কোণ-গাঁথা ফুলস্কেপ কাগজগুলা কাড়িয়া লইল এবং সাগ্রহে নিষ্প্রভনেত্রের ক্ষুধিত দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহাতে যে হস্তাক্ষর লিখিত ছিল তাহাকে কদর্য্য বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। এ বিষয়ে নরেশের মন্তব্যটাকে 'বিনয়' বলিয়া ভ্রম করিবার কারণ নাই। কিন্তু বহুকালের অনাবৃষ্টির পর সামান্য এক পশলা জলেও যেমন প্রকৃতির অপরিচ্ছন্নতা ধুইয়া চিক্কণ দেখায়, নিরঞ্জনেরও সেইরূপ কর্ম্মবন্ধনবিহীন ছন্নছাড়া জীবনের সমুদয় এলোমেলো গ্রন্থিগুলা যেন এতটুকু কাজের নাগাল পাওয়াতেই একটি ক্ষণের ভিতরে সংযত ও সম্বদ্ধ হইয়া উঠিল। সে দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া একখানা চৌকি লইয়া বসিয়া সাদা কাগজ কয়খানা টানিয়া লইল।

সেদিন অপরাহ্নে পরিমল যখন বৈকালিক বেশভূষা সমাধা করিয়া আনিয়াছে, তেমন সময় তার নিজস্ব দাসী অন্নদা আসিয়া জানাইল

রাজাবাবু তাহাকে ডাকিতেছেন। পরিমল আসিয়া দেখিল নরেশ কয়েকখানা বই হাতে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

"কি এ গুলো? নতুন কোন গল্পের বই বেরিয়েছে বুঝি? বাঁধানর এমন ছিরি কেন?"—বলিয়া উহারই একখানা টানিয়া লইয়াই পরিমল ঠোঁট উল্টাইল—"হরি! আবার এই মাথা মুণ্ডু নিয়ে আসা হয়েছে। আমিতো বলেইছি, এ সব আর আমার দ্বারা হবে না। বুড় হয়ে মর্ত্তে যাচ্চি, এখনও কি না রয়েল রিডার নম্বর থ্রি পড়া!"

নরেশচন্দ্র হাসিলেন, "ওর চেয়ে যে আর ওপোরে উঠতে পারলে না, সৈ! আমার কি সাধ যে চারকাল ধরেই তুমি কচি খুকির পড়া পড়? না, এবার এই রাজকীয় "পঠনা"র গণ্ডী তোমায় পার হতেই হবে, পরি!"

পরিমল বই কয়খানা সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া স্বামীর প্রশস্ত স্কন্ধের উপর মাথা রাখিয়া আবদার করিয়া বলিল, "ও আমি পড়বো না।"

"কেন পরি?"

"বুড় বয়েসে শেখা যায় না। দেখলে তো পারলুম না।"

নরেশ বলিলেন, "দেখ, তা' যদি বলো, আমি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি, বুড় বয়েসে সামান্য লেখাপড়া শেখা তো কিচ্ছুই নয়, একেবারে আগা পাস্তলা বিবি বনে যেতে পারা যায়।"

পরিমল স্বামীর কথায় হাসিয়া ফেলিল, তারপর ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বিষণ্নস্বরে কহিল, "তারা হয়ত আমার মতন পাড়াগেঁয়ে গরীব ঘরের মেয়ে নয়, তাই পারে।"

নরেশ কহিলেন, "তা' নয় পরি! ও তুমি একেবারে ভুল করলে! আজ পাড়াগেঁয়ের ছেলে মেয়েরা সহরে এলে যত বড় সহুরে হয়ে ওঠে, সহরের বুকে সাতপুরুষে বাস করে তার সিকিটুকুও হয় না।

সংক্রামক রোগের মধ্যে সর্ব্বদা যারা বাস করে, তাদের চাইতে বাইরের লোকদেরই সংক্রামিত হওয়ার ভয় বেশী কিনা। যাক্ ও সব তর্কাতর্কি তুলে রেখে দাও, তোমায় আমি এম্-এ, বি-এল পাশ করে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীর দরখাস্ত পাঠাতেও অনুরোধ করছিনে, আর বিলাত ঘুরতেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্চিনে;—মাত্র খামের উপর চিঠির ঠিকানাটা লেখা, বা ছোটছেলে মেয়েদের অক্ষর পরিচয়টা করাবার মতন পুঁজিটুকু পর্য্যন্ত না রাখলে চলবে কেন বলতো? এইটুকু চাওয়ারও কি আমার যোগ্যতা নেই?"

পরিমলের গাল দুটি ঈষৎ লাল হইল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "চিঠি লেখবার তো আমার অনেকই আছে! আর ছোটছেলে—তা' যদি ঈশ্বর দেন, তাদের শেখাবার লোকের এ বাড়ীতে অভাব হবে না।"

"আহা! ঐখানেই যে তোমাদের গলদ পরি! মা বাপের কাছে শিক্ষা না পেলে সন্তানের প্রকৃত শিক্ষাই হয় না। প্রথম থেকে মাইনে করা মাষ্টার গবর্ণেসের ব্যবস্থার মতন ছোট ছেলে-মেয়েদের উপর নিষ্ঠুরতা আর কিছুতেই নেই। মা হতে ইচ্ছা থাকলে সন্তানের শুভাশুভ চিন্তা বাদ দেওয়া চলতে পারে না। নিজেকে তার জন্যে তৈরি কর, পরিমল!

পরিমল ক্ষুণ্ণচিত্তে জবাব দিল, "একটু একটু শিখ্‌ছি তো। তবে খুব বেশী আমার হবে না। কাককে কি কোকিল করা যায়? হ্যাঁগা, আজ আমায় পার্সী থিয়েটারে নিয়ে যাবে? 'মোহন-মুরলী' দেখে আসবো।"

নরেশ স্ত্রীকে একটু সন্তুষ্ট করিয়া কাজ আদায় করাই সুযুক্তি বোধে, ঐখানেই থামিয়া গিয়া জবাব দিলেন, "বেশতো, যেও।"

"তুমি যাবে না? খুব নাকি চমৎকার করেছে।"

নরেশ সংক্ষেপে কহিলেন, "ভাল! দেখে এসে গল্প বলো, শুনবো।" পরিমল দুঃখিতস্বরে কহিল, "আমি কি নাচতে জানি, না গাইতে পারি যে, দেখাব, শোনাব? যা সুন্দর ওরা নাচে গায়, অ্যাকটিং করে সে না দেখলে—"

নরেশ উত্তরে কহিলেন, "তাই তো বলছি শিখে নাও সব। কলাবিদ্যা কি তুচ্ছ! গাইতে শিখবে? রাজী হলে না তো শিখতে।"

পরিমল গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "থাক, আমি একাই যাবো, অন্নদাকে নিয়ে। তোমায় যেতে হবে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরের পরাণ মনের মাঝারে যত তোলাপাড়া হয়
তার সনে যদি তোমার মনের নাহি থাকে পরিচয়
আচরণ-তার বিচার করিতে যেওনা যেওনা তবে,
তুমি যাহা ভাবো কলঙ্ক, তাহা অস্ত্রের লেখা হবে!
হয়ত সে রণে তুমি হেরে যেতে, সে তবু হয়েছে জয়ী,
ক্ষতের চিহ্ন বহিছে এখন ক্ষতের যাতনা সহি।

—তীর্থরেণু

দু'চারজন বন্ধু আসিয়া একটা পুরাতন দাবী দিয়া সেদিন নরেশকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "ওহে রাজা! তুমি এতবড় ফাঁকিবাজ হয়ে উঠ্‌লে কেমন করে বলোতো?"

নরেশ তাদের দাবী বুঝিয়াও অজ্ঞতার ভাণে চাপা বিরক্তির মন্দ হাস্যে জবাব দিলেন, "কেন, চা দিতে বল্‌তে দেরী হয়েছে বুঝি? ওরে সাতকড়ে!—"

নলিনবিহারী নরেশের এটর্ণী বন্ধু মুখ বিকৃত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, "এইও! খবরদার! একেবারে বোকা বোনো না! চায়ের তেষ্টা আর সরভাজা রাজভোগের ক্ষিধে নিয়েই আমরা রাজ-দরবারে ভোজের আর্জি পেস করাতে আসিনি! যে কথা আমাদের দিয়েছিলে, সেইটে রাখ্‌ছো কবে তাই বলো?"

নরেশ আসমান হইতে পড়িয়া দুইচোক বিস্ফারিত করিলেন, সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিলেন, কথা দিয়েছিলুম! অথচ রাখিনি!—এমন তো কিছু মনে পড়ে না! "জোচ্চোর", "গাধা" প্রভৃতি অনেক মিষ্টি বচন শোনালে, ঠাণ্ডা হয়ে দুটো আইস্‌ক্রিম্ আর খান দুচ্চার খাস্তা

কচুরির সঙ্গে ছানার জিলিপি খেয়ে যাও দিকিনি, রাণী-সাহেবার খাস তৈরি,—খাসা হয়েছে!"

সাতকড়ি হাজির ছিল, বাবুদের জন্য জলখাবারের ফরমাসের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। হরিধনঠাকুর্দ্দা ডাকিয়া বলিলেন, "হারুকে আমার হুঁকোটা ফিরিয়ে একছিলিম দিয়ে যেতে বলে যাস্ বাবা!"

নলিন নরেশের বাক্‌চাতুর্য্যে ভুলে নাই, অসন্তোষের সহিত বলিল—"সুয়োরাণীর খাস মহল তোমার খাসা রকম বজায় থাক, আমাদের সেথায় ভাগ চাইনে ভাই! দুয়োর দুয়োরটা এখনও যে অত করে চেপে রেখে কেনই দিয়েছো, সেইটে শুধু আমাদের মত নিরেট বোকাদের বোঝা কঠিন হয়েছে। ঐটুকুই একটু বুঝতে চাই!—এদিকে তো খবর পাচ্ছি, মধু-বাসর সম্পন্ন করে ফেরা অবধি এই তিন বৎসরে দুঃখিনী দুয়োরাণী একেবারেই মহারাজের চক্ষুঃশূল হয়ে গিয়েছেন! তাঁর মুখ দর্শনও নাকি আর ভ্রমক্রমেও করা হয় না। অথচ তাঁকেও দেবে না নরলোকের মুখ দর্শন করতে? এ তোমার জুলুম নয়? কিন্তু আর সেটা হচ্চে না! আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে এই যে খোসামোদ করে করে মরচি, একটি দিনের জন্যও অপ্সরীর গলার গানও যদি শোনাতে। কি করে বলি কথার তোমার ঠিক আছে। ছোঃ!"

ননীবাবু নলিনকে চোখ টিপিয়া নিজেই তার হইয়া দরবার করিতে আসিল, "আঃ থামো না নলিন! অত ব্যস্ত কেন? আমার ছাত্রীর গান শোনবার জন্যে তুমি অনেক দিন থেকেই ব্যস্ত হয়েছ বটে, তা সুবিধে হলেই রাজা তোমায় কি আর না শোনাবেন? সত্যি রাজা! অত করেই যে সুরমাকে সঙ্গীত বিদ্যেটা শেখালুম, তা সেটা কি মাঠেই মারা যাবে? এমনি করে ছেড়েই যদি দেয়,

তাহ'লে অনর্থক উভয়তঃ এতটা পরিশ্রম করে কি ফল হলো বল তো? আগেকার মতন, কখন-সখন—এই আমাদের ক'জনার মধ্যে সে যদি একটু আধটু গাইতে-টাইতে নাই পেলে, তাহলে তারই বা বারমাস একঘেয়ে বন্দীজীবন ভাল লাগে কি করে? এই তিনটে বচ্ছর তো আমি বা ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত তার ওখানে গেলে ঢুকতে পাইনে'। তা ভাই, ছেলে মানুষের প্রতি এতটা কড়াকড়ি করা কি ঠিক হচ্চে?"

ঠাকুরর্দ্দা হুঁকার নলে মুখ লাগাইয়া একমনে টানিতে টানিতে একবারটি মুখ তুলিয়া ছোট্ট করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে মানুষের পক্ষে বাঁধনটা বড্ড বেশী কড়া হয়ে পড়েছে বই কি! অল্প একটু ঢিলে দিলে হয় ভাল—অ—ল্প।"

নরেশ এবার ব্যথিত নেত্র তুলিয়া তাঁর পুরাতন বন্ধু বৃদ্ধ-সহচরের উপর তাহা সংন্যস্ত করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "আপনিও যোগ দিলেন—?"

তাঁর কণ্ঠে অবিচারিতের সুদৃঢ় অভিমান ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

হরিধন অপ্রতিভ হইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া বলিলেন, "আরে, না'রে দাদা ভাই! তা' আমি বলচিনি, সুরমা যে কত ভাল মেয়ে সে আমি সবই জানি বই কি! তবে কিনা,—তবে কিনা, এতটা বিদ্যে যে শিখেছ;—এই তোমারই বন্ধুবান্ধবের কাছে তোমারই সাক্ষাতে বসে দুটো গেয়ে শোনালে দোষটা কি? সেই কথাই মাত্র আমি বলেছি ভাই! ওরা যে আমায় খেয়ে ফেল্লে! বলে তুমি তার ওস্তাদ, তোমার কি তার উপর কোন দাবী নেই? তা' আমি আর কি বলবো দাদু? তাই—"

নরেশ বন্ধুদের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া জবাব দিলেন, "আপনি সাফ বলবেন, তা' আপনার নেই।—তা' হ'লে আপনাকে আর জ্বালাবে না।"

শুনিয়া তবুও নলিন মুখরভাবে কহিয়া উঠিল, "যদি পুরাতন প্রেম

ঢাকা পড়ে যায় নব নব প্রেমজালে,'—তা' হ'লে তাকে 'তবু আমার হারেমে বন্দী থেকো' না ব'লে বিদায় দিলেই পারো! তা'বলে একটা নিরীহ জীবের উপর এত অত্যাচার সহ্য করা যায় না! আমাদের ঘরে তো আর নূতনের আমদানী হয়নি।"

নরেশের দুই চোখ রাঙ্গা হইয়া কপালের শিরা সাপের মতন মোটা হইয়া উঠিল। সমস্ত শরীরে একটা প্রবল আক্ষেপ উপস্থিত হইল, দুই হাতের মুঠা কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু তার পরও যখন অচল হইয়া নিজের আসনেই বসিয়া রহিলেন, তখন দেখা গেল, একটা অদম্য উত্তেজনার স্রোতকে সংহত রাখিতে, তাঁকে সঘনে কম্পিত বিবর্ণ অধরকে দাঁত দিয়া চাপিতে হইয়াছে।

বন্ধুবরেরা পরস্পর দৃষ্টির ইঙ্গিতে পরস্পরকে নিজেদের হতাশার খবরটা দিয়া চুকিল; কিন্তু একান্ত লোভাতুর নলিনবিহারীর এতেও মন মানিল না। সে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"তা'হলে আমাদের গান শোনানোর আশা যে দিয়ে আসছিলে সেটা স্রেফ একটা—"

নরেশ ইহার পাদ পূরণ করিলেন, "ধাপ্পা! হ্যাঁ, তাই।"

"তা'হলে আশা পূর্ণ হবে না?"

নরেশ চোখের দৃষ্টি সোজা রাখিয়া শান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না।"

"গোড়া থেকে বল্লেই হতো!"

"বলেছিলুম অনেকবার, তোমরা মানতে চাওনি।"

"তুমি বলেছিলে,—সে আমাদের সামনে গাইবে না। কিন্তু ডাক্তার, ননী—এরা সব বল্লে যে, তুমি হুকুম কল্লে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাচতে পারে, গাওয়া তো চাট্টিখানি কথা! সে তোমায় নাকি যমের মতন ভয় করে'!"

"করুক! আমি বল্‌বো না।"

"এ সোজা কথা!"

বন্ধুরা বিদায় লইবার পূর্ব্বে আর একটা খোঁচা দিয়া গেল, "ওহে রাজা! তোমার সেই জাম্বুবান-মন্ত্রীটা গেলেন কোথায়? শুনছিলুম সে নাকি তোমার বাড়ীতেই রয়েছে?"

নরেশ কহিলেন, "আছে বই কি! তাকে যে আমি চাকরী দিয়ে রেখেছি। খাসা ছেলে!"

সব ক'জনেরই চোখে মুখে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি উথলিয়া উঠিল।

"কোন্ কাজে বাহাল হলেন, বাছাধন?"

নরেশ ভৎর্সনার ভাবে চোক ফিরাইয়া অথচ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার স্ত্রীর মাষ্টার করে দিয়েছি।"

"তা'হলে তো কায়েমী বন্দোবস্তই হয়েছে! কিন্তু দেখ' ভাই! ছেলে মানুষ যেন অন্ধকারে আঁতকে ওঠে না!"

বন্ধুরা বিদায় হইলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মন লইয়া নরেশ স্ত্রীর খোঁজে উপরে উঠিলেন। তাদের বিদ্বিষ্ট ও বিদ্রূপবাক্যই তাঁর উভয় সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিয়া তুলিল।

পরিমল তখন চুল-বাঁধুনীর কাছে পরিপাটী সিঁথিপাটী করিয়া কেশ রচনা করাইতে ছিল। আশে পাশে আয়না, চিরুণী, গন্ধ তৈল, ভিজা গামছা, আরও কত কি ছড়ান। পিছনে বসিয়া সোণার তাগা পরা, হাতখালি, নরুণ পেড়ে ধুতি পরা আন্নাকালী সাতগুছির চ্যাটা বিনাইতে বিনাইতে বাগবাজারের রায়েদের বাড়ীর বৌ-ঝিয়েদের সৌখীনত্বের শত শত উদাহরণ জমা করিয়া দিতেছিল। পরিমল উৎকর্ণ হইয়া সেই সকল মুখরোচক কাহিনী গোগ্রাসে গিলিতে গিলিতে মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রশ্নও করিতেছিল; যথা—"হ্যাগা, তাদের বৌরা বিকেলে বেলায়

বার মাসই বেনারসী বোম্বাই সাড়ী এই সব পরে? সুতী সাড়ী বিকেলে পরা বুঝি নিয়ম নয়?"

আন্নাকালী বলিল, "না ভাই, তারা ও সব রোজই পরে। তা' পরবে নাই বা কেন বলো? পয়সার তো কারু কিছু কমি নেই। অন্য লোকেদের যেমন আটপৌরে কলের সাড়ী কেনা হয় না,—তেমনি ওদের গাদা করে ওই সব কিনে আনে। তা' আপনি কেন বিকেল বেলা একখানি করে পাতলা বেনারসী, পার্সি, কি জামদানী ঢাকাই পরেন না বৌরাণী! আপনারও তো রাজার ঐশ্বয্যি, কিসেরই বা অভাব আছে!"

পরিমলের কাঁচা মনে এই সকল অনাস্বাদিত সুখের প্রবাহ প্রলোভনের ঘন জাল বিস্তার করিতেছিল। তথাপি ঈষৎ বিজড়িতভাবে কহিল, "আমার কি ওসব পরে থাকলে মানায়? লোকে হয়তো হাসবে, বলবে, 'কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সাধ!'

প্রসাধনকারিণী অবাক—অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, হাসবে না, বলে ইয়ে করবে! কেন আপনি কি সেওড়া গাছের পেত্নী নাকি যে গায়ে আপনার কিচ্ছুই মানায় না? রংটাই যা একটু চাপা তা' বৌরাণীর আমাদের মুখের কাট্-টাট্ কেমন দিব্যি! চুলটি পিট ঝাঁপা, মুখখানিও তো আমি খাসা দেখি! তা' আপনাকে বলবোই বা কি! পয়সা হলেই তো আর রূপ কিনে আনা যায় না, বড় বড় লোকের ঘরে কটাই বা সুন্দরী আছে? যত সব ধনীর ঘরে দেখবেন, সবার অঙ্গেই প্রায় ধার করা রূপ! সাবানে-পাউডারে, বিলিতি-রং, খড়ির গুঁড়ো, সুরমা, ভুরু আঁকবার পেন্‌সিলের টানে—আর হীরে মতি জরি সিলিক, তার উপরে ইলেকট্রিকের আলোর ঝিলিক। আপনিও এই দেখুন না, আমার হাতে যখন পড়েছেন, দু'মাসের মধ্যে গৌরবর্ণ না করে কি আর

ছেড়েছেন ভেবেচেন? ওই আপ্‌টানটী কিন্তু ছুটীবেলা ভাল করে লাগানো চাই—বাদামবাটা, পোস্তবাটা, কাঁচা দুধ, কুসুম ফুল, কাঁচা হলুদ ঐতেই রং কাটবে। ও সাবান ফাবানের কর্ম্ম নয়—"

এমন সময় অন্নদা আসিয়া খবর দিল, "রাজাবাবু শীগ্‌গির আপনারে ডাক্‌ছেন।"

দুই দিকে দুইটা বিনুনী ঝুলাইয়া অসমাপ্ত বেশ-ভূষায় পরিমল স্বামী সন্দর্শনে ছুটিল। মনে অবশ্য এই অ-প্রস্তুত অবস্থায় দেখা দিতে একটু কুণ্ঠিত হইতেছিল। আহা, সেই আসিলেনই যদি আর একটু পরে আসিলেই তো হইত্‌!

নরেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সোজা কথায় বলিয়া গেলেন, "দেখ পরি! মিসেস্ বসুর কাছে পড়া শোনা তোমার কিছুই এগুচ্ছে না, তাই ভাবছি তাঁর বদলে একজন মাষ্টার ঠিক করা যায় তো কেমন হয়?"

পরিমল বিনুনী শুদ্ধ মাথা সবেগে নাড়া দিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "একটুও ভাল হয় না। কেন, মিসেস্ বসু তোমার কি করলেন শুনি?"

নরেশ হাসিয়া কহিলেন, "ভয়ে কবো না নির্ভয়ে?"

"নির্ভয়েই বলে ফেলো।"

"তিনি আমার পাড়াগাঁয়ের নিরাড়ম্বর সাদা সিধে পরিমলকে সহরের 'ডানা কাটা' পরীদের পাশে দাঁড় করাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, আর কিছু নয়।"

পরিমল বেণী দুলাইয়া বাঁকা চোখে অভিমানের বাণ হানিল,—"ডানা-কাটা পরী যদি আমি হতে পারতুম, তাহ'লে কিনা ও সব খোঁটা আমায় তুমি দিতে পারতে! কি আমি করেছি বাপু? ভাল ভাল

সাড়ী জ্যাকেট গহনাপত্র অত অত সব আমায় কিনে দাও কেন তবে? না দিলে তো আর আমি চেয়ে চেয়ে নিয়ে পরতে যেতুম না।”

নরেশ সস্মিতমুখে তার নাকটিতে নাড়া দিয়া বলিলেন, “আমার কাজ আমি করি, তোমার কাজ তুমি করলেই পারো। যাক্ ওসব ঝগড়ার কথায় কাজ নেই। শোন, তুমি জানো লেখা পড়া শেখা আমার পছন্দ। শুধু বিলিতি বিবিদের বেশ-ভূষাকেই অনুকরণ করলে চল্‌বে না, তাদের সদগুণগুলিও ঐ সঙ্গে নিতে হবে। আর যে, যা' বলুক, আমাদের দেশের মেয়েরাও কস্মিনকালে মূর্খ থাকতেন না। বই পড়া কম থাকলেও এবং না থাকলেও মৌখিক ও দৃষ্টান্তের শিক্ষা সে-কালের মেয়েদের অপর্য্যাপ্তই ছিল। তোমরা ঘরের বাইরের সবই ত্যাগ করচো। শিখে নিচ্চো শুধু বিলিতি বিলাস সুখটুকু। তা করোনা, বড় আশা করে তোমায় নিয়েছি, আমাদের সন্তানেরা যেন নির্ম্মল ও নিখুঁত মা পায়। তাদের তা' পেতে দিও, পরি!”

পরিমল মুখটা খুবই প্রসন্ন করিতে পারিল না।

নরেশ আবার বলিলেন, “যাহোক, আমি যা বল্‌তে এসেছি সেটা শুনে নাও; নিরঞ্জন কাজের জন্য ব্যস্ত করচে, তার কাছে যদি তুমি খানিকটা করে পড়ো সে মন্দ হয় না। বেচারা ভারি ভদ্রলোক। লেখা পড়াও বোধ হয় জানে মন্দ নয়।”

পরিমল ঘোরতর অপছন্দের সঙ্গে প্রবলবেগে আপত্তি তুলিয়া বাক্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই বাধা দিল, “বল কি তুমি! ওই মুখ-পোড়াটার কাছে আমায় পড়তে হবে? কক্ষোনো না, কক্ষোনো না,—ওর কাছে আমি কিছুতেই পড়ব না! মাগো ওটা বাঁদর কি মানুষ তারই তো ঠিক নেই!”

একটা প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাস নরেশের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া হু-হু

শব্দে বহিয়া গেল। আরক্ত মুখে তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "পরিমল! ওকথা মুখ দিয়ে বার করতে তোমার লজ্জা হলো না! কেমন করে বল্‌লে তুমি? এই তোমার' উপরে আমার ভবিষ্যৎ বংশের জন্য আমায় উচ্চ আশা পোষণ করতে হয়েছে! যাকে আজ অত ঘৃণা দেখালে, কেমন করে জান্‌লে যে সেই লোক একদিন খুবই সুপুরুষ ছিল না?" তোমাদের মতন রূপযৌবনগর্ব্বিতা সুন্দরীদের কারুকে আগুন থেকে বাঁচাতে গিয়েই যে ওর ওদশা ঘটেনি, তাই কি তুমি জোর করে বল্‌তে পার? সে হবে না—ওরই কাছে তোমায় প'ড়তে হবে।—কাঁদ্‌ছো, তা' কাঁদো, শুধু কান্নায় এতবড় অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয় না!"···

বন্ধুদের ব্যবহারে পূর্ব্বাবধিই যে বিরক্তি মনের মধ্যে এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিল, দ্বিতীয় সংঘর্ষে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া বহ্ন্যুদগম করিল। ঘোর অসন্তোষের কালিমাচ্ছন্ন ললাট ও গম্ভীর মুখ লইয়া নরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এখনও এখনও মন সে নামে শিহরে কেন ?

—অশ্রুমতী

সেই নকল করা কাগজ ক'খানি হাতে করিয়া নিরঞ্জন যখন নরেশচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাঁর পাঠাগারের দ্বারদেশ হইতে গৃহোদ্যানের সবুজ ঘাসওয়ালা জমির ধার পর্য্যন্ত পাইচারী করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহাকে যেন কোন নূতন মানুষ বলিয়াই ভ্রম হইতে পারিত। বাহিরের চেহারা অবশ্য বদলাইয়া যাইবার উপায় ছিল না, মুখের একটা দিক গভীর ক্ষতচিহ্ন গহ্বরের মতই গভীর হইয়া গিয়াছে, সে দিকের রংটাও কালির মত কালো, বাকী সবটুকুও বসন্ত ক্ষতের হস্তে নির্ম্মম-ভাবে অত্যাচারিত।—কিন্তু কি আশ্চর্য্য বদলাইয়া গিয়াছিল তার ভিতরটা! প্রসন্ন স্মিতহাস্যে সমস্ত মুখখানা যেন বৈশাখী ঝড়ের শেষে চাঁদের আলোর রেখাটুকুর মতই স্নিগ্ধ দেখাইতেছিল। মূর্চ্ছাতুর অন্তরের সমুদায় নিদ্রিত বৃত্তিগুলি সহসা যেন কার যাদুযষ্টির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া বিস্মিত আনন্দে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল, "তবে তো আমরা মরি নাই রে—মরি নাই!"

নরেশ ঘোর অসন্তুষ্টমনে নীচে নামিয়া আসিতেই নিরঞ্জনের হাতের বাণ্ডিলটার উপর নজর পড়িয়া গেল।

"কি, পেরে উঠলে না বোধ হয়? সে তো আমি তোমায় বলেই দিয়েছিলুম"—বলিতে বলিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। মনটা তাঁর প্রথম দফায় বন্ধুবর্গ ও দ্বিতীয় দফায় স্ত্রীর উপর বিরক্তিতে তিক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই উভয় মনোবাদের প্রধানতম ও মূলীভূত কারণ নিরঞ্জনকেও তাই বেশ মধুর মনে হইল না।

কিন্তু নিরঞ্জন বেচারা সে কথা বুঝিবে কেমন করিয়া, সে নিজের মনের গভীর আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া একমুখ হাসির সহিত কথা কহিয়া উঠিল; বলিল, "পারবো না কেন? আপনার লেখা তা'বলে অতদূর মন্দ নয়।" এই বলিয়া সে অতি সুন্দর ছাঁদে লেখা কয়েকখানি কোণগাঁথা কাগজ নরেশচন্দ্রের দিকে বাড়াইয়া দিল।

সেই লেখাটার উপর নজর পড়িতেই নরেশচন্দ্র যেন আকস্মিক দণ্ডাহতের মতন চমকাইয়া উঠিলেন। এ লেখা!—একি তাঁর পরিচিত?—বড় পরিচিত নয় কি? দুই মুহূর্ত্তেরও অধিককাল শুদ্ধ বিস্মিত দুই নেত্র স্থির করিয়া তিনি সেই কাগজগুলার উপর চাহিয়া রহিলেন। এ লেখা কা'র? কোন পুরাতন দিনের সুখ-স্মৃতি জালে জড়িত হইয়া এর প্রত্যেকটী অক্ষরের ছবি তাঁর মনোদর্পণের মধ্যে প্রতিফলিত রহিয়াছে! কিন্তু এ যার প্রতিনিধি, তার আসল রূপ কোথায়? কা'র হস্তাক্ষর এ? এত পরিচিত, এত আপনার বলিয়া যাহাকে দেখিয়া চন্দ্রোদয়ে স্ফীতবক্ষ জলধীবৎ অন্তর তাঁর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে সে কা'র হাতের লেখা?—কিছুই স্মরণে আসিল না।

মুখ তুলিতেই একটি সমুৎসুক দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল। নরেশের দৃষ্টি গম্ভীর এবং অনুসন্ধিৎসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—কই, না, এ মুখ, এ তাঁর চিরদিনের অচেনা। অন্তরের কোণে কানাচে খুঁজিয়া কোথাও তো এর ছায়াটুকুও ভাসিতে দেখা গেল না! তবে এই হাতেরই লেখা এমন পরিচিত সন্দেহ হয় কিসে? শুধুই অমূলক সংশয়? না এর ভিত্তিমূল কোথাও কোন গভীর গহ্বরে নিহিত আছে? কিছুক্ষণ চিন্তাকুল অস্বস্তচিত্তে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে হাল-ছাড়াভাবে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টির আঘাতে বিপন্নপ্রায় নিরঞ্জনের মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া আবার তাহারই হস্তাক্ষরযুক্ত কাগজখানা

দেখিলেন। তারপর হঠাৎ অসাধ্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহজভাব অবলম্বন করিয়াই সপ্রশংস ও সস্মিতমুখে কহিয়া উঠিলেন, "বাঃ বাঃ! ভারি সুন্দর তো হে, তোমার হাতের লেখাটী! আমার সেই কাগের ছানা বকের ছানা গুলি যেন মন্ত্রপূত হয়ে নতুন জন্মলাভ করেছে দেখছি যে!"

নিরঞ্জন সপ্রীত-সলজ্জহাস্যে দৃষ্টি নামাইয়া কুণ্ঠিত-বিনয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু কি কপি করবার আছে?"

নরেশ তাহার আগ্রহে অকস্মাৎ অত্যধিক উৎসাহিত হইয়াই উঠিলেন, "কপি করবার সাধ যদি তোমার এতেও না মিটে থাকে নিরঞ্জন! তা'হলে তোমার কাছে কি কৃতজ্ঞই থাকবে ঐ "কর্ণধার" প্রেসের কম্পোজিটাররা। আমাকেও হতে হবে। ওদের কাছে গাল খেতে খেতে আমার বিষম-খাওয়া উচিত ছিল! প্রুফ দেখাও—এক মহামারী ব্যাপার! নিজের লেখা,—সে কি নিজেই বুঝি? সাধ করে কি,—অবশ্য অবস্থান্তরে আতঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"অনেক লেখার অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করবো মোচন,
আমায় হয়ত করতে হবে আমার লেখার সমালোচন।"

কিন্তু সে তবুও বরং পদে আছে, নিজের লেখার প্রুফ তার চেয়েও যে ঢের বেশী শক্ত, সে হয়ত তাঁদের জানা নেই।"—বলিয়াই নরেশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া লইলেন।

নিরঞ্জন বলিল, "তা'বলে আপনার হস্তাক্ষর অতটা কদর্য্য নয়, যতটা ওকে লজ্জা দিবেন। যাই হোক্ যখনই দরকার হবে আমাকে আপনার লেখা দেবেন; আমি কপি করে দেবো—"

নরেশচন্দ্র অকস্মাৎ হাসি বন্ধ করিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, "নিরঞ্জন! তুমি ইংরেজীও বেশ জানো, না? চুপ করে থাকলে কেন?

বল্লে কি কিছু ক্ষতি হবে? কি ক্ষতি? আমি দেখেছি সে দিন তুমি লাইব্রেরী ঘরে বসে কালো বাঁধাই কি একটা বই পড়ছিলে। সে বইটা হয় ডিকেন্সের কোন নভেল, কিম্বা বায়রণের কোন কাব্য।"

নিরঞ্জন তার নত মুখখানা চকিতে তুলিয়া চাহিল। মুখে যেন রক্তচিহ্ন নাই! ম্লান ও শুভ্র অধর তার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্ত অত্যন্ত ব্যথিত বেদনায় আর্ত্তচোখে চাহিয়া থাকিয়া পরিশেষে সে যেন অস্ফুট বিলাপের ভাষায় কহিয়া উঠিল, "কি জানি কেন আবার ওই সব জন্মান্তরের স্মৃতিগুলো আমার মাথার মধ্যে এসে ভিড় হচ্ছে! মনে করেছিলুম, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! কিন্তু তা' কই যায়নি তো!" বলিয়াই সে সজোরে কপালটা দু আঙ্গুলে টিপিয়া ধরিল ও স্খলিত পদে পাশের দেওয়ালে দেহের ভর রাখিল। নরেশের বুঝিতে বাকি থাকিল না, পূর্ব্বস্মৃতির মতন জ্বালাময় এ লোকটীর কাছে যেন আর কিছুই নেই। এমন কি সেই তার নিঃসহায় অবস্থাটাও নয়! এইটেকে সে যেন সব চেয়ে বেশী এড়াইয়া চলিতে চায় বলিয়াই নিজেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাস্তার ড্রেনের ধারে ঠেলিয়া ফেলিতে ও কুণ্ঠিত হয় নাই। না জানি কি সেই ভীষণ অতীত,—স্মৃতির মধ্যে যার এমন দহনশীলতা?

আর কোন আলোচনা তখনি তখনি না করিয়া তিনি আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন। দরজা পার হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তখনও সে তেমনি করিয়া কপাল টিপিয়া ধরিয়া নিঝুম হইয়া আছে। বড় মায়া হইল। সংসারে কত বিড়ম্বনাই যে কতজনা ভোগ করিতেছে; কা'র দুঃখ কম কার দুঃখ বেশী ওজন করিবার উপায় তো নাই!

তবু যারা নিতান্ত কাছে আসিয়া পৌঁছায় তাদের জন্য সাধ্যমত কিছু কিছু না করিলে যে মনুষ্যত্বকে অবমাননা করা হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে !
পূজার তরে হিয়া, উঠে যে উথলিয়া, পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে ?
—মানসী

বিবাহিত জীবনের কয় বৎসরে স্বামীর যে পরিচয় পরিমল পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁর চরিত্রে আর যা থাক একটা প্রচণ্ড জিদ ছিল ইহা নিঃসন্দেহেই সে জানিয়াছে। সদানন্দ ভোলানাথ কিন্তু একটু অবাধ্যতায় তাঁর শিবমূর্ত্তি রুদ্ররূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই খামখেয়ালীর কথা মনে করিয়া পরিমলের সমজিদি মন উত্যক্ত হইয়া উঠিল। মন তার বিদ্রোহ করিয়া বলিল, মানুষের সকল ইচ্ছার উপর দখল লওয়া অত্যাচার ! উচিতের দিক্ দিয়া যতই দাবী করা হোক, মানুষ নিজেকে এমন ব্যক্তিত্ব-হীন করিয়া ফেলিতে পারে না, যাহাতে অন্যের আদর্শকে সম্পূর্ণ নিজের করিয়া লইতে পারে। হাসিমুখে যে পারে না, সেটা সে নিজেকে দিয়াই বুঝিত। পরিমল রাগ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিল। অভিমানে আহত হইয়া ভাবিল, সমানে সমানে না পড়লে কোন পক্ষেরই মান থাকে না। আমি গরীব অনাথা বলেই আমার উপর জবরদস্তি চালান ? হতুম আমি বাগবাজারের রায়েদের মেয়ে কি বৌ-গাঁয়ের জমিদার-রাজাদের কেউ, তা'হলে এত জোর চালাতে পারতেন ? আমার কেউ নেই, বাপের বাড়ী যাবার ভয় দেখাব, তারও উপায় নেই জানেন কি না, তাই না আমায় সব কিছুতেই বাধ্য করতে সাহস করেন।"

খানিকটা কাঁদার পর মুখ তুলিতেই নজর পড়িল খাটের সামনের কাপড়ের আলমারিটার আঁটা কবাটের উপর। দুচোক ভরা জলের উপর আরও খানিকটা জলের আমদানী করিয়া সে সবেগে মুখখানা ফিরাইয়া

লইল। তাই কি ছাই শরীরে তার রূপই আছে! বিধাতার করুণার দান,—অর্থ দিয়া যেটা ক্রয় করা যায় না বলিয়া ধনী গৃহের বিলাসী মেয়েরা অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় লাগিয়া থাকেন, পরিমলও সেই বস্তুটার অভাব একান্তরূপেই অনুভব করিল। রূপহীনতার কথা মনে করিবার অবসর তার ঘটে নাই। ভোগে ও স্বাস্থ্যে যে অপরিজ্ঞাত সৌন্দর্য্য সে নব-জীবনে লাভ করিয়াছিল, তাই ছিল তার গর্ব্বের জিনিষ, বিস্ময়ের বিষয়। অতিরিক্ত পাওয়ার গুরু ভারে ক্লিষ্ট নিঃস্ব দেনদার চারিদিকে হাতড়াইয়া ঋণশোধের একটা সিকি পয়সাও খুঁজিয়া না পাইয়া স্বামীর চেয়ে সৃষ্টি-কর্ত্তার উপর অভিমানী হইয়া উঠিল। বড় লোকের মেয়েদের মা বাপ আছে, তাদের টাকা আছে, তারা কালো কুৎসিত হলেও ভাল ঘরে পড়িতে আটকায় না, অ-দরকারে রূপের বোঝা তাদের না চাপাইয়া এই সব অভাগা জীবেদের জন্য কি রাখা চলিত না? যদি একটু রূপ থাকিলে, একটু গুমোরও ত করিতে পারিতাম, বুঝি ইহারই মূল্যে আমার লইয়াছেন! নিছক দয়ার মূল্যে বিকাইয়া যাওয়া হইতে বাঁচিতাম। এমন বিনামূল্যের কেনা বাঁদীর দশা ত ঘটিত না!

রাগের মাথায় নরেশচন্দ্রের উদ্ভট দারিদ্র্য-প্রেমকে যৎপরোনাস্তি অপভাষা প্রয়োগ করিল। এমন কি অন্নদা দাসী চুল বাঁধা অসমাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া ডাকিতে আসিলে, তার সঙ্গেই এ বিষয়ে আলাপ করিতে বসিয়া গেল "তাবলে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়! গরীবকে দয়া কর্ব্বে বলে কি সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করবে!"

অন্নদার সহিত তার মনিব-পত্নীর মতের যে এতখানি মিল ছিল, ঘুণাক্ষরেও জানা থাকিলে সে বোধ করি পড়সীর বাড়ী বাড়ী অনর্থক পেট খালি করিতে ছুটিত না। ঘরে বসিয়াই পাড়ার কুৎসা ইহার সঙ্গেই চালাইতে পারিত। উৎসাহিত হইয়া মনিব-পত্নীকে সমর্থনপূর্ব্বক সাগ্রহে

কহিয়া উঠিল, "ও কথা কেন আর বল্‌চেন রাণীমা! রাজাবাবুর পছন্দর ছিরিই যদি থাক্‌বে, তা'হলে আর ভাবনা কি! এই দেখই না, কত রাজা জমিদার হেঁটে হেঁটে পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্‌লো, তা'নাদের পরী পরী মেয়ে ফেলে উনি কোন পাড়া'গাঁর,—মরুকগে! মুখ্যে আগুন লাগুক আমার! ওমা কি কথা বল্‌তে কি কথা বলি, দেখ্য একবার কাণ্ডখানা! এই জন্যেই বলে গো, বুড় হলে বাহাত্তুরে ধরে! কিছু মনে নিও নি মা! কার সাম্‌নে কি কথা হচ্ছে,—তোমার দিব্যি মা! নিজ্যস্‌ ভুলে গেছি। ন্যাও বাছা! চুলটো ফিরিয়ে ন্যাওসে অবলার মা আট্‌কে রয়েচে, তাকে পাঁচ বাড়ী তো ঘুরতে হবে।"

পরিমল ঢিলটী মারিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাটকেলটি খাইল!

আশ্চর্য্য! এ'ও আবার মানুষকে গালে চড় মারিয়া মনে পড়াইয়া দিতে হয়? 'রাজাবাবুর যদি পছন্দর শ্রীই থাকিবে' তবে বাগবাজারের চন্দ্ররায়ের মেয়ে সুন্দরী সাগরিকা, অথবা যৌ-গাঁয়ের রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়ে সুখলালিতা সুধালতা আজ রাজা নরেশচন্দ্রের রাণী না হইয়া পথে কুড়ান পরিমল সেই আসন দখল লইল কেমন করিয়া? আজ একটা কদাকার ভিখারীর প্রতি সমাদরকে সে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, তাহাকে আদর দেখান লইয়া অভিমানে অভিভূতা হইয়াছে, ধনী মানী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া, অশন বসনের অভাবে পরাশ্রিতা, অপরিচিতা এই যুবতীকে বিবাহ করিয়া ধনীর দুলাল যেদিন ঘরে তুলিলেন, সেদিন তাঁর পরিচিত এবং অপরিচিত সকলকার অধরে কি ঘৃণা তাচ্ছিল্যের হাসি কি ক্রোধাভাষই না ব্যক্ত হইয়াছিল!—সে কি তা' জানে না? পাড়াগেঁয়ে মেয়ে হলেও এই অপরিচিত প্রাচুর্য্যময় নগর নিবাসে, খেতাবী-রাজার রাজ-প্রাসাদে আনিতা হইয়া সে হাড়ে হাড়ে তাহা অনুভব করিয়াছে। যখন

আসিয়াছিল, এ বাড়ীর দাসীচাকরদের শুদ্ধ নাকি তার আচার ব্যবহার ও চেহারা দেখিয়া লজ্জায় ধরণীগর্ভে প্রবেশেচ্ছা জন্মিতে ছাড়ে নাই। অন্যে পরে কা কথা! বৌ-ভাত উপলক্ষ্যে দেশের বাড়ী হইতে সংশাশুড়ী ও তাঁর মেয়ে অলকানন্দা আসিয়াছিলেন। সৎমা হইয়াও তিনি নরুর পাশে এমন বউ সহ্য করিতে পারেন নাই! তিনিও গরীবের মেয়ে। চেলি-চন্দনে পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া গরীব বাপ তাঁকে লক্ষপতি গিরীশচন্দ্রের পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তাঁকে সম্প্রদান করেন, কিন্তু এক হিসাবে নিঃস্ব গরীবের মেয়ে অনেক ধনী কন্যাকে লজ্জা দিয়া দশের মধ্যে মাথা খাড়া করিতে পারিতেন,—সে তাঁর অনবদ্য সৌন্দর্য্য! পরিমলের যে ইহারই অভাব। তাই ধনীর মেয়ে না হইয়াও যিনি রাজার মেয়ের মতই নিজের অনমিত রূপ গৌরবে, মাটির জগৎকে তাচ্ছিল্যভরে দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁর কঠিন নেত্রের সাবজ্ঞ দৃষ্টিতে নিঃস্ব পরিমল ঘৃণা-লজ্জায় মাটি হইয়া গিয়াছে। সে সব কথা আজ ফুটিয়া থাকা কাঁটার মতই খচ্ খচ্ করিয়া উঠিল। মাতা-পুত্রের একদিনের আলাপ দৈবাৎ তার কাণে যায়;—সেই কথা কয়টা ব্যথার উপর তীব্র-প্রলেপের মত স্মৃতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। স্বামীকে ডাকাইয়া প্রায়-সমবয়সী বিমাতা রত্নাবলী অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "দেশে থেকেই শুনেছিলেম, তুমি এক চাটগেঁয়ে ধেড়ে মেয়ে কুড়িয়ে এনে এতবড় মিত্তির বাড়ীর বউ ক'রে দিচ্ছো? কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে মেয়ের রূপের দিকটাও এমন! এ কেলেঙ্কারী করার চাইতে এত দিন যে পথে চলেছিলে—সেও যে ছিল ভাল। সে তবু বোঝা যায়, এ যে দুর্ব্বোধ্য!"

নরেশচন্দ্র এই ভীষণ অভিযোগের বিরুদ্ধে একটি বর্ণও ব্যবহার করেন নাই।

সেদিনে কৃতজ্ঞতার মাত্রাটা এত বড় ছিল যে, ইহাতেও নরুকে বড়

বেশী নাড়া দিতে পারে নাই, কিন্তু আজ এই গোপন কথার সবই যখন দাসী-প্রসাদাৎ জানা হইয়া গিয়াছে, তখন এত বড় অবমাননাজনক তুলনাটা স্মরণে আনিয়া এবং এই লজ্জাস্কর অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বামীর তুষ্ণিভাব বুকের মধ্যে অভিমানের তুমুল তরঙ্গ তুলিল। অন্নদা ঠিকই বলিয়াছে—নরেশচন্দ্রের প্রবৃত্তিই যদি নিম্নাভিমুখী না হইবে, তবে সেই বা আজ এই ঐশ্বর্য্য-স্বর্গে প্রতিষ্ঠিতা কেন? রাগ করিবার কিছুই নাই।

পরিমল সত্যসত্যই নেহাৎ গরীব ঘরের মেয়ে। শুধুই তা নয়, এ সংসারে আপনার বলিতে তার কোন বালাই ছিল না। বাস তাদের সুদূর পূর্ব্ব-বঙ্গের পল্লীগ্রামে। কলিকাতা নিবাসী নব্য শিক্ষিত বহু সম্পত্তির অধিকারী খেতাবধারী 'রাজা' নরেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের পত্নীপদ লাভ করিবার মত কোন সুযোগ বা সামর্থ ঐ মেয়ের ছিল না; একেবারে এ অবিসম্বাদী সত্য! তথাপি এমন অঘটনও তো ঘটিল! এর জন্য দায়ী কে? খেয়ালী নরেশ, না বিধাতা? ধন না থাক, রূপ না থাক, ভদ্র সমাজের, শিক্ষিত সমাজের উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষাই কি তার ছিল? বিদ্যার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়নখানা পড়িয়াছে, আর বুদ্ধির মধ্যে ভাত ডাল ও সাধারণ ব্যঞ্জন রান্নায় যতটুকু খরচ পড়ে সেই পর্য্যন্ত। রূপ?—সেটা তার নিজের দিক হতে সুস্পষ্ট ছিল না। সে যে বাড়ীর মেয়ে এবং যে সমাজের মানুষ, সেখানে আয়না ধরিয়া রূপের পরিমাপ করার রেওয়াজ নাই। মা ছিলেন, ভাবী শক্র ছিলেন, দিনান্তে বা দুই দিনে মোটা চিরুণীতে আঁচড়াইয়া চুলটা তিনগুছিতে আঁটসাঁট শক্ত খোঁপায় বাঁধিয়া দিতেন। শেষের দিকে যখন রাজা স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে; মা ছাড়িয়া কোন জীবিত আত্মীয়ই তার ছিল না! না একজন ছিল, সে ছিল আন্দামানে! অবস্থা এতই তখন প্রতিকূল যে, সৌন্দর্য্য রক্ষার চেষ্টা দূরে থাক, ধ্বংস কামনাই প্রবলতর। তার প্রতি কমলারাণীর বরপুত্রটির যে আকর্ষণ এর মধ্যে

রূপ মোহের কথাও নাই, এ কথাটা জোর গলাতেই বলা চলে। গুণই বা কি দেখিলেন? অনেকের মতে নরেশের ঘাড়ে ভূতে ভর করিয়া তাহাকে দিয়া এই অপকর্ম্ম করাইয়াছে, হয়ত তাই;—পরিণত যৌবনে অসহায়া নারীর যে সব আপদ ঘটা সম্ভাব্য, তাহারই বিড়ম্বনায় পরগৃহ-বাসিনী পূর্ণযৌবনা মেয়েটী বিব্রত। মা মরার সঙ্গে সঙ্গে সকল পূর্ব্ব ব্যবস্থাই দৈব দুর্ব্বিপাকে কাঁচিয়া গেল। যে নিরাপদ নীড়ে সে বাসা বাঁধিবার কল্পনা সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া করিয়া আসিয়াছে, আকস্মিক কালবৈশাখীর ঝাপটায় সেই আশাতরী মাঝদরিয়ায় বানচাল হইল। তারপর নিরালম্ব জীবন লইয়া সে অকূল সাগরের ঢেউ খাইয়া খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, কূল পায় নাই। গ্রামের তারা নূতন বাসিন্দা, নিজস্ব পুরাতন সুবাদ কাহারও সহিত ছিল না। অপর পক্ষে থাকিলেও হিন্দুঘরের আইবুড়-ধাড়ী মেয়ে কোন ভদ্রলোকে গলায় ঝুলাইবে? পরিমগ্ন স্রোতের ফুলের মত ভাসিতে লাগিল। তার পূর্ব্বাশ্রয় যখন খসিয়া পড়িল, ঘর বাড়ী ধন দৌলত সব কিছুই দূর সম্পর্কে বেদখল যারা লইল, শুধু তারা তাহাকেই বাদ দিল। এই খবর শুনিয়া একজন প্রতিবেশী ঘরে স্থান দিলেন। সে সময়ে তাঁর গৃহিণী সূতিকাগারে আবদ্ধ থাকায় হাতপোড়াইয়া রাঁধিয়া খাইতে ও খাওয়াইতে হইতেছিল। গৃহিণী অসহায়া মেয়ের খবর জানাইলে সহজেই সম্মত হইলেন; কিন্তু মেয়েটি কয়েকদিন পর মধ্যরাত্রে কাঁদিয়া ব্যাধ-বিতাড়িতা হরিণীর মতই সূতিকাগৃহের আগড় ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিল এবং গৃহিণীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "আপনার বাড়ী নিরাপদ মনে করে ঢুকেছিলেম, কিন্তু পথে পথে ভিক্ষা করে খাব, তবু এখানে আর থাকবো না।"

গৃহিণী নিজের ঘরের খবর জানিতেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

সে চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দিল, "যে দিকে দুচোখ যায়।"

গৃহিণী কুণ্ঠিত মুখে কহিলেন, "সে সবখানেই যে মন্দ লোকের কুদৃষ্টি নেই তাই বা কি করে জানবে মা? আমি বলি কি তার চাইতে নিজে একটু সাবধান হয়ে এইখানেই থাক। রাত্রে আমার কাছে এসেই শোবে, সকালে নদী-চান করে আসবে। আমার বাছারা তবু সময় মতন দুটী ভাত পাবে, আর তোমরাও—বাছা! যে বয়েস তোমার তাতে এই নির্ব্বান্ধব অবস্থা, তোমার পক্ষে কোথায় যে ভয় নেই কিছুই বলা যায় না।"

অনেকক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবিয়াও সে সংসারতত্ত্বে অভিজ্ঞা গৃহিণীর সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ মানিয়া লইতে সমর্থ হইল না। সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের আঘাতে অন্তরের মধ্যে আহত-নারীমর্য্যাদা গুমরিয়া ফিরিতেছিল। নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল, এবং সেই বাড়ীতে দ্বিতীয় রাত্রি কাটাইবার ভরসা না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই তার বুকফাটান অতীতের সকলটুকু অসহ্য-স্মৃতির মাঝখানকেও সে নিজের নারী মর্য্যাদা হানির বহু উর্দ্ধে বরণ করিয়া লইয়া কাঙ্গালের মতন কাঁদিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। ঠিক সেই সময়ে ঝি ছাড়িয়া যাওয়ায় গণ্ডগোল চলিতেছিল, তাই এবার সেখানে আশ্রয় পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হইল না। বাড়ীর কর্ত্তা একটু আপত্তি তুলিতে ছিলেন, যদি এর পর এই আইবুড় মেয়ের বিয়ে দিতে হয় ত কি হইবে? এ আপত্তি টিকিল না, বাটীর গৃহিণী বাসন মাজিতে নারাজ থাকায়, নথ ঘুরাইয়া ঐ যুক্তি এই বলিয়া খণ্ডন করিলেন, সেজন্য ভাবিতে হইবে না। ঝি জুটিলে উহাকে কোন অছিলায় দূর করিয়া দিলেই হইবে। ঝি কিন্তু সুবিধা মতন পাওয়া গেল না এবং মাসকতক পরেই একটা অঘটন ঘটিয়া দেশশুদ্ধ লোককে স্তম্ভিত করিয়া দিল!

কলিকাতা অঞ্চলের বড়লোক, ওই অঞ্চলেরই কাছাকাছি তাঁর জমিদারী,—একদিন আসিয়া বসন্ত মহামারীতে উজোড় হওয়া সে গৃহের পূর্ব্বাধিকারীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত খোঁজ খবর লইয়া হঠাৎ উদ্যোগী হইয়া উহাকে বিবাহ করিলেন। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে বিস্তর অযাচিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে অনাথাকে অন্ন ও আশ্রয় দিতে নারাজ ছিল, তারাই বিশেষ করিয়া তার আকস্মিক-প্রাপ্ত সুখ সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এমন কি সেখানের একজন অনাহুত উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীও এ বিবাহের বিরুদ্ধে বিস্তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়া নিজ কন্যাকে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজাপতির আশ্চর্য্য-নির্ব্বন্ধ শত বিঘ্ন ঠেলিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল! বৈচিত্র্যময় জগতের এ'ও এক বিচিত্র ঘটনা! বিবাহকারী যুবককে লোকে পাগলই স্থির করিল। কচিৎ কেহ বলিল; "পাগল নয়, দয়ালু।" কিন্তু তারাই মুখবিকৃত করিল, "এও তা' বলে ভাল না।"

সেই সব ভয়াবহ পূর্ব্বস্মৃতির তোলাপাড়ার মধ্য দিয়া পরিমলের মন কোন সময় লঘু হইয়া আসিয়াছিল। স্বামীর জিদকে আর জুলুম বলিয়া মনে রহিল না, বরং বিপন্ন-বৎসল ও দয়ার আধার বলিয়াই কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। অহঙ্কারের মদগর্ব্বে সে আজ কাহাকে বিচার করিতেছে!

নবম পরিচ্ছেদ

ছোটরে করিয়া ঘৃণা করেছ যে পাপ,
তোমারে করেছে নীচ তারি অভিশাপ।
তাদের না কর যদি উচ্চাসন দান,
ঘুচিবে না কভু তব 'নীচ' অপমান॥

—প্রবাসী

সূর্য্যের আলোভরা অলস মধুর মধ্যাহ্নে কলিকাতার এই কোলাহল-বিরল অংশটী পল্লীবিজনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। দীপ্ত স্নিগ্ধ দিনটীর দিকে চাহিয়া নিরঞ্জন নিরালা ঘরের খোলা জানালার ধারে বসিয়াছিল।

জানালার নীচের বাগানে রং বেরংএর কৃষ্ণকলি, জিনিয়া আর রজনীগন্ধা প্রচুররূপে ফুটিয়াছে। পাশের বাড়ীর সীমাবিভাগের প্রাচীর গাত্রে একটা বক ফুলের গাছ আধহেলা হইয়াছিল, তার ডালপালার মধ্যে লুকানো কি পাখীর তীক্ষ্ণ মধুর শিষ্ দেওয়ার শব্দ আসিতেছিল। ইহারই পাশের তরুলতার ঝোঁপটাকে নাড়া দিয়া কয়েকটা শালিক কি যেন খুঁটিয়া খাইতেছে এবং কিচির মিচির শব্দে আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকাশ করিতেছে। বাগানের জমিটি কয়েকটি বর্ষণ পাইয়াই নয়নলোভন শ্যামলতায় চিকণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই আর্দ্র তৃণ হইতে একটা অতি মৃদু সজল গন্ধ সসঙ্কোচে উঠিয়া মন্থর ভাবে বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইতেছিল। বাহ্য জগতের এই সমাহিত ভাব নিরঞ্জনের মনে প্রবিষ্ট হইয়া তার নিরানন্দ চিত্তে একটা শান্তির মাধুর্য্য প্রদান করিতেছিল। শান্তিহীন দুষ্ট স্মৃতির তাড়না এই শান্ত মধুর প্রকৃতির শান্তিধারা যেন মন হইতে ধৌত করিয়া দিয়াছে।

দরজার কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইল; দোরটা খুলিয়া গেল, পেঁচোর মা মুখ বাড়াইয়া ঘরের মধ্যটা দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। একপাশে নেয়রেবোনা শয়নের খাট, আর এক ধারে একটি টেবিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, বই আর তারই মধ্যে কয়েকখানা ছোট বড় কারেন্সি নোট খোলাই পড়িয়া আছে। পেঁচোর মা প্রায় নিঃশব্দে আসিয়া উহার মধ্য হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইয়া আবার তেমনিভাবেই বাহির হইয়া গেল, গৃহাধিকারী কিছুই জানিল না। টাকাগুলা তাহাকে নরেশচন্দ্রের খাজাঞ্চি বেতন হিসাবে আজই দিয়াছে।

বাবুর খানসামা সাতকড়ি আসিয়া ডাকিয়া উঠিল, "মাষ্টার মশাই!"

প্রথম ডাকে নয়, দু তিন ডাকের পর নিরঞ্জন মুখ না ফিরাইয়াই জবাব দিল, "উঁ?"

—"বলি, মাইনে পেলেন, তা' আমরা যে আপনার অসুখে বিসুখে এতটাই করলুম, বলি, আমাদেরকে বকশিষ দেবে না?"

নিরঞ্জন তদবস্থাতেই উত্তর দিল, "নাওনা ভাই! ঐখানেই আছে।" সাতু এই উত্তরই এর কাছে আশা করিয়া পেঁচোর মার হেয় নীতি অবলম্বনে বিরত ছিল। খাম হইতে নোট কয়খানা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত নিই?"

"যা তোমাদের খুসী।"

"তাহলে এই পঁচিশের মধ্যে পনের আমরা বকশিষ নিলুম, আর এই দশটা টাকা আমার কাছেই আমানত রইলো, দরকার হ'লে বলবেন, বার করে দোব। বাড়ীর দাসী চাকরদের বেশ একটু হাত-টান আছে, সে ত আমার কাছে চাপা নেই, কে কখন গেঁড়া দিয়ে দেবে। কি বলেন মাষ্টার মশাই? রাখবো কি আমার সুটকেসে? তা'তে বিলিতি কুলুপ দিইছি।"

নিরঞ্জন একটা কথাও কানে না তুলিয়া জবাব দিল, "বেশ।"

বোকারাম মাষ্টারের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার তুলনা করিতে করিতে প্রসন্নমনে সাতকড়ি টাকা লইয়া চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "খাজাঞ্চী বাবু তো পঁইত্রিশ টাকা দিয়েছিলেন, আর দশটা কোন চিলে ছোঁ মারলো? অ্যাঁ!"

বক ফুলের গাছের ডালে সুখসমাসীন পাখীটা একটা তীক্ষ্ণ উচ্চরব করিয়া ডানা ঝাড়া দিতে দিতে উড়িতে আরম্ভ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল। সেই আকস্মিকশব্দে চকিত হইয়া উঠিতেই নিরঞ্জনের কর্ণে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান প্রবেশ করিল, "মাষ্টার মশাই!"

আহ্বান নারী-কণ্ঠের এবং 'পেঁচোর মা' শ্রেণীর কাহারও নহে, তাহা নিরঞ্জনের স্বাভাবিক বুদ্ধিই জানাইয়া দিল। সে স্বভাবের বিরুদ্ধ বিস্মিত ও উত্তেজিত ভাবে মুখ ফিরাইতেই এক সুদর্শনা নারীর সহিত মুখামুখী হইয়া গেল। রমণীর সাজসজ্জায় ও হাবভাবে তাহাকে উচ্চ জগতের জীব বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয়না। এই পরিচয়ে একাধারে বিপন্ন, বিরক্ত ও বিজড়িত নিরঞ্জন হাত তুলিয়া একটা নমস্কার জানাইতেও সমর্থ হইল না।

ঘরে ঢুকিয়াছিল বাড়ীর কর্ত্রী স্বয়ং। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক করিয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছিল—কিন্তু সে যে এত কঠিন, এ ধারণা ছিল না। নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিতে সে ভরসা করে নাই, তার খালি পায়ের দিকেই তার চোক ছিল। বসন্তের গভীর ক্ষত চিহ্নের সেখানেও অভাব ছিল না! দুর্ব্বল শীর্ণ পা দুখানি কাঁপিতেছে লক্ষ্য করিয়া দয়ার্দ্র ভাবে বলিয়া ফেলিল, "আমি আপনার কাছে পড়তে এসেছিলুম, যদি আপনার শরীর ভাল না থাকে, তাহলে আজ থাক।"

এই বলিয়াই ফিরিতে গিয়া এমন একটা স্বর শুনিল এবং এমন করিয়া সে চমকাইয়া উঠিল যে, যেন সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল ও ত্রস্ত কণ্ঠস্বর অদৃশ্য নিক্ষিপ্ত তীরের মত পিঠে তার সুতীক্ষ্ন ফলা বিঁধিয়া দিয়াছে। ভয়ার্ত্ত মুখের পাংশু ছবি লইয়া চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সাম্‌নে কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথির মতই এক বিকৃত এবং দাহ্য পদার্থে বিকৃত অপরিচিত মুখ! তবে সেই বিশেষ পরিচিত স্বরের রেশ কোথা হইতে এই অজানাকে আশ্রয় করিয়া, এত দিন পরে অকস্মাৎ জাগ্রত মধ্যাহ্নে ভাসিয়া আসিল? এ স্বপ্ন না সত্য? পরিমলের বুকের মধ্যে সন্দেহ আশঙ্কা ও সংমিশ্রিত আগ্রহ একত্রে উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্ন? স্বপ্ন কেমন করিয়া বলিবে? মানুষ কখন জাগিয়া স্বপ্ন দেখে? উৎসুক-নেত্রে উৎকণ্ঠা ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়াই নিরঞ্জনের নতমুখ দেখিতে লাগিল এবং অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিয়া ফেলিয়া পূর্ণ অবিশ্বাসে, দীর্ঘ করিয়া একটা শ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক কহিল, “বই তো আমি আজ আনিনি,—যাহোক একটু পড়ান তবে। বলে গেছেন, আপনার কাছে পড়তে।”

নিরঞ্জনের যে কথার স্বরে সে চমকিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই, “কি পড়তে চান বলুন, আমি পড়াচ্চি।”

নিরঞ্জন এই কথার মধ্য হইতে অনেকখানিই অনুভব করিল। তার চাকরীটা যে কি, এতদিনের পর এবার সেটা আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু সে যে এমন মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, এ সংশয় সে অভাগার মনের কোণেও উদিত হয় নাই, নরেশ অবশ্য কাজটাকে কঠিন বলিয়া স্বীকার করিয়া এবং কৃতকার্য্যতায়ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না।—কিন্তু সেটা যে এত কঠিনরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে জানা থাকিলে, —জানা থাকিলেই বা নিরঞ্জন কি করিত? জীবন ও আশ্রয়-দাতাকে সে

কি মুখের উপর বলিতে পারিত, তাঁর এই সামান্ত কাজটুকুও তার দ্বারা ঘটিবেনা? সকল সঙ্কোচ মনের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল, কণ্ঠস্বরের অযথা কম্পনকে যথাসাধ্য নিরোধ-চেষ্টার সহিত সসম্ভ্রমে উত্তর করিল, "লাইব্রেরী থেকে কোন বই বেছে দেবেন কি? এখানে তো কোন বই নেই।"

পরিমলের পায়ের তলা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত প্রবলবেগে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল। সে আবার বৃথাই দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই ভস্মস্তূপ এবং অর্দ্ধদগ্ধমুখের রহস্য-জটিলতা যেন উলটিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু না, কোন নিদর্শনই ত নাই! তবে কোথা হইতে, সেই পরিচিত,—অতিবড় পরিচিত কণ্ঠধ্বনি আজ বারেবারেই সুদূর অতীত, করুণ-কঠিন-ভয়াবহ অতীতের মধ্য হইতে বিস্মৃতির ধূলি জঞ্জাল ঠেলিয়া বাহির হইতেছে! একি পরিমলের কল্পনা? সত্য নয়? একি তার স্মৃতির তারে যে অবিস্মৃত অতীত আজিও সর্ব্ব-সুখ-সম্পদের মধ্যেও কাতর মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তারই একটা রেশ, আর কিছুই নয়? আবার একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। এর সান্নিধ্য ছাড়াইতে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, "আজ তবে থাক, কাল বই নিয়ে আসবো।"—বলিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া গেল।

তখন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে নিজের পরিত্যক্ত আসনখানার উপর সবেগে বসিয়া পড়িয়া উর্দ্ধমুখে শ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বক নিরঞ্জন আর্ত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আবার সেই ছায়া! সে নয়,—তবু সেই! মানুষ আমায় থাক্‌তে দেবে না!—আবার দেখছি পাগল করে পথে বার করবে!"

দশম পরিচ্ছেদ

পথিক দরজায়, বিদেশী অসহায়,
কাতর সে যে হায়, বিষম ঝড়ে,
নাই মা, বধূ নাই, খেতে কে দেবে ভাই,
কে তা'রে দেবে ঠাঁই বৃষ্টি পড়ে।

—তীর্থসলিল

পঠন পাঠন চলিতে লাগিল। যদিও গুরু শিষ্যা উভয়ের পক্ষে এই শিক্ষাদান ও লাভে আগ্রহ বা আনন্দের সম্পর্ক ছিল না। উভয় পক্ষেই দায় ঠেলার খাতির মাত্র, সুতরাং ফলও তদনুযায়ী হইল না তো কি! পরিমল পূর্ব্ব সংস্কার এবং প্রথম যুক্তিতর্কে মন হইতে তাড়াইয়া ছিল। একজনের গলার স্বরের মতন কি আর এক জনের গলার স্বর থাকে না? এ বোধ হয় কখন হাসে না, কিন্তু তাঁর হাসিই তাঁর সব্বার বড় সৌন্দর্য্য ছিল! এর আড়ন সেই রকমই বটে, কিন্তু সে রং, সে চোক, সে চুল, সেই বলিষ্ঠ দৃঢ় গড়ন—সে সব এর কোথায়! তারপর তার ঠোঁটের কোণে একটী ফোঁটা হাসি এবং চোকের কোলে ফোঁটা দুই অশ্রু দেখা দিল। আমিও কি পাগলের বাতাস লেগে পাগল হচ্ছি নাকি? কি ছাই ভাবছি! যাকে নিজের চোকে মরতে দেখলেম, পুড়িয়ে পর্য্যন্ত এলো, তার সঙ্গে কার কতটুকু মিল খুঁজলে মেলে, সেই ভাবনায় মাথা ঘামিয়ে লাভ! মনকে সে কড়া হুকুমে ঠাণ্ডা করিতে চাহিল। সেদিন পড়িতে গিয়া বই খুলিবার আগে মুখ খুলিয়া এবং মুখ তুলিয়া নিরঞ্জনের বিদগ্ধ ও বিব্রত মুখের দিকে করুণচোকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তার মনটা করুণায় ও বেদনায় নিবিড়ভাবে ভরিয়া আসিল, তখন গভীর সহানুভূতি ও ব্যথা বিজড়িত চিত্তে তার আলাপ করিতে বসিল।

নিরঞ্জন নতমুখে পাঠ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ম্যাকমিলানের ছাপা স্কুল পাঠ্য বইএর মাপাজোকা রচনার পরিবর্ত্তে কর্ণে প্রবেশ করিল,— "আপনার দেশ কোনখানে ছিল?"

নিরঞ্জন চমকিয়া উঠিল; তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়া নিজের কপাল টিপিয়া ধরিল; আরও খানিক পরে সে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, "বসিরহাট।"

"বসিরহাট! তবেতো ঠাকুরঝিদের দেশেরই লোক আপনি! হারাণচন্দ্র ঘোষদের জানেন? নাম শুনেছেন অবশ্য? সেই হারাণ ঘোষের মেজো-ছেলেই আমার নন্দাই। তার নাম জ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ। সে গেল বছর ওকালতি পাশ করে বারাসতে উকিল হয়েছে। জানেন তাকে? বড্ড ভাল ছেলে, গো-বেচারী একেবারে।"

পরিমলের বোধ করি মানুষের পরিচয়ে তার গো-জন্মের আভাস সুব্যক্ত থাকাই গৌরবজনক বলিয়া বোধ ছিল। তার নিরীহ প্রকৃতির নন্দাইটির প্রশংসা সে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠেই করিল, এবং ইহার মধ্যে প্রসুপ্ত রহিল যারা 'গো-বেচারী' নহে, তাহাদের সম্বন্ধে ঈষৎ গ্লানি।

নিরঞ্জন আবার যেন ইতস্ততঃ করিল, তারপর সঙ্কুচিতভাবে জবাব দিল, "ওঁকে আমি চিনিনে, আমি অনেকদিন দেশ ছাড়া।"

ঈষৎ দমিয়া গিয়া পরিমল তখন ছোট্ট করিয়া একটী "ওঃ" বলিয়া নিজের পাঠ্য পুস্তকের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল, এবং তৎপরে পুনশ্চ সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে আছেন? আপনার মা বাবা নেই বোধ হয়? ভাই বোন আছেন ত? আর কেউ? আর কোন আত্মীয়?"

একটা দীর্ঘ ও ব্যথাভারাতুর নিঃশ্বাসের শব্দ তার সকল উৎসাহকেই

দমিত করিয়া দিয়া আরও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতই বাহির হইয়া আসিল,—"কেউ না।"

পরিমলের বুকে সেই স্বর ভীষণবলে বাজিয়া উঠিল, নিঃসঙ্গ নিঃশেষিত মরুভূমির মত জীবনের ভয়াবহ শূন্যময়তা সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তরেরও অন্তরে অনুভব করিল ও তার অকৃত্রিম সহানুভূতি একান্ত-ভাবেই এই সর্ব্বহারা এবং আত্মহারা অভাগাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সে যে জানে—এই নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব পরিত্যক্ত জীবনের দুঃখ যে কি দুর্ব্বিসহ—সে যে নিজে ভুক্তভোগী। সে যে নিজের বুকের ভিতর হইতে এ অপরিমেয় দুঃখের রিক্ততা ও তিক্ততা আজও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারে। যে দয়ালু-লোক পথপ্রান্তে মরণশয্যাসীন ইহাকে কুড়াইয়া আনিয়া সযত্ন সেবায় জীয়াইয়া তুলিলেন, সেই তাঁর উদার চিত্ত তার জন্য না কাঁদিত—যদি সেই তিনিই তাহাকেও ওম্‌নি করিয়াই পথের ধূলার মধ্য হইতে—নিজের বুকে তুলিয়া না লইতেন—তবে আজ তার অবস্থা এর চাইতেও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত না কি? স্বামীর দয়া কি অসীম, তাঁর পরে তার কৃতজ্ঞতা কত গভীর হওয়া উচিত! নিজের মধ্যে যে জিনিষটা অপর্য্যাপ্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা পর্য্যাপ্ত দেখিয়া, নিজের প্রতি সে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অথচ, মনটাকে ফিরাইতে চাহিয়া তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "আপনার হাতের লেখা তো খুব সুন্দর! ইংরেজী উচ্চারণও কম জানার মতন তো লাগে না, কেন আপনি কাজ কর্ম্ম না করে অত কষ্ট সইছিলেন? কতদিন বাড়ীছাড়া হয়েছেন আপনি?"

নিরঞ্জন এই প্রশ্নগুলা নতমুখে শুনিয়া গেল, কিন্তু তাঁর ভাবশূন্য নিশ্চল শরীরে উত্তর দিবার চেষ্টা জাগ্রত হইবে কি না, প্রমাণ পাওয়া গেল না। অগত্যা পরিমল কৌতূহলবৃত্তি দমন করিয়া পাঠ্য পুস্তকে

মনোনিবেশ করিল এবং অনেকখানি পড়া হইয়া গেলে যখন বুঝিতে পারিল, মাষ্টার মশাইএর কানে হয়ত তার পাঠের শব্দও প্রবেশ করিতেছে না, এম্‌নি অন্যমনস্কতায় তাহাকে অভিভূত রাখিয়াছে, তখন আবারও কিছুক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল। কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সমস্ত শরীর মনে ভীষণ ভাবে শিহরিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অকস্মাৎ মনে হইল, সে যেন কোন এ-জগতের প্রাণীর সান্নিধ্যে নাই!—এই যে মানুষটির সামনে সে রহিয়াছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে এর যেন কোথায় একটা যোগ আছে কিন্তু সে যেন পুরোপুরি এখানের নয়! চেহারাখানা এর মানুষেরই মত, গলার স্বরও এ দেশেরই সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, কিন্তু না,—তবু না—কিছুতেই ইহাকে রক্তমাংসের জীবিত পদার্থ মনে করা যায় না। এ যেন কার ছায়া, কোন্ সুদূর প্রস্থিতের মায়ামূর্ত্তি এর মধ্যে খুঁজিলে সুস্পষ্ট মিল খায়, শুধু সেইটুকু—আর বাকি সবখানিই এর অবাস্তব, অসঙ্গত, অনাসৃষ্টি! পরিমলের মনটা ছমছমে হইয়া উঠিল। এই শব্দহীন—স্পন্দনেরও চিহ্ন যার মধ্যে সব সময় সুস্পষ্ট নয়, তার সান্নিধ্যকে সভয়ে বর্জ্জন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটিয়া পলাইল। ভাগ্যে কেহ দেখে নাই!

নরেশ বেড়াইতে বাহির হইতেছিলেন, পরিমল খবর দিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "দেখ, নিরঞ্জনকে আর কোন কাজ দিয়ে আমার জন্য অন্য কোন লোক ঠিক করে দিতে পারো না? সেই যদি পরিশ্রমই করবো, তা'হলে যাতে কাজ হয়, তাই তো করা ভাল!"

নরেশ পরিমলের মুখে মাষ্টার মশাইএর বিদ্যা ও বিনয়ের খ্যাতি শুনিয়াছিলেন। আজ হঠাৎ উল্টা অনুযোগে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন, আবার কি হলো?"

পরিমল বলিল, "হয় নি কিছুই, তবে পড়া বড় একটা হয় না কিনা তাই বলছি উনি এত অন্যমনস্ক, অনেক সময় নষ্ট হয়।"

নরেশ নিজেও সেটা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই স্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া চিন্তিতমুখে কহিলেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি, ওকে কি কাজ দিতে পারা যায়। কিছু না দিলে ওম্‌নি রাখা যাবে না, সেই হয়েছে মুস্কিল!"

পরিমল বোধকরি পূর্ব্বেই এ বিষয়ে ভাবিয়াছিল, প্রস্তাব করিল, "ছাপাখানার কাজ দেওয়া চলে না?"

নরেশ কহিলেন, "দেখি, তাই যদি কিছু পারে। ইংরাজী মন্দ জানে না, কিন্তু বাংলা যদি তেমন—"

পরিমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া উঠিয়া গিয়া এক টুকরা কাগজ লইয়া আসিল ও স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

নরেশ দেখিলেন একটা কবিতা। কৌতূহলী হইয়া পড়িলেন;—

"কাঁদিতে এসেছি আমি কাঁদিয়াই চলে যাব,
এসেছি অনন্ত হতে অনন্তেই মিলাইব,
দুঃখের তরঙ্গ তুলি, এসেছি আপনা ভুলি,
খুঁজিব বিরাট বিশ্ব কোথা গেলে সীমা পাব!
জগতে হবে না সুখী এ পোড়া পরাণ মন।
অসীম দুঃখেরে আমি করে আছি আলিঙ্গন।
আপনি নীরবে রহি, আপন যাতনা সহি,
অপরে করিতে দুঃখী চাহে নাকো এ জীবন।
ভবের সুখের আশা করিয়াছি বিসর্জ্জন!" *

---

* ৺ইন্দিরা দেবীর গীতি-গাথা হইতে।

কবিতা অসমাপ্ত।—নরেশ পাঠশেষে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে' লিখেছে—নিরঞ্জন ?"

পরিমল মাথা দুলাইয়া সায় দিল। তারপর বলিল, "আরও দুটো একটা ওঁর টেবিলের তলায় পড়েছিল। আর একটা মোটে ক' লাইন লেখা। সে আমার মনেই আছে ;—

পাব কি না পাব ফিরে কেন বৃথা এত ভয় ?
কেন, কেন এ সংশয় !
যখন দাঁড়াব গিয়ে তোমার চরণতলে,
আমার গচ্ছিত নিধি ফিরাইয়া দাও বলে,
না দিয়ে পারিবে কিগো ফিরাইতে দয়াময় !
তবে কেন এ সংশয় ?

"মাষ্টার মশাইএর নিশ্চয় বউ ছিল, বেচারী মরে গেছে, তাইতে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না ?—কিন্তু স্ত্রীকে কি রকম ভালবাসে বলতো ?"

নরেশ হাসিয়া নিজের স্ত্রীর ভরা গাল দুইটা টিপিয়া দিয়া জবাব দিলেন, "ঠিক যেন মহাদেবের মতন ! স্ত্রীও হয়ত সতী-ঠাকরুণের মত পতির জন্য দেহ ত্যাগ করে থাকবেন !"

কথার মধ্যে উভয়পক্ষেই অনুযোগ ও উপযোগ ছিল। খোঁচা খাইয়া পরিমল সেটুকু শোধ করিয়া দিল—"তাই না কি বলা যায় ? এই সেদিন কালীঘাটে একটী মেয়ে স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ আর ডাক্তারের মুখে 'আশাহীন' শুনেই তক্ষুনি নিজের প্রাণটা নষ্ট করে ফেল্লে, কিন্তু স্বামী ভদ্রলোক সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে স্ত্রীর অত বড় আত্মত্যাগের মূল্য শোধ করলেন কি দিয়ে জানো ? বৎসর না ঘুরতেই নূতন বউ ঘরে এনে ! এই তো তোমরা !"

নরেশ ঘটনাটি জানিতেন, মাথা পাতিয়া অভিযোগ গ্রহণ করিতেই হইল। তবে অবশ্য রহস্য করিয়া জবাব দিলেন, "তা' শিবঠাকুরও শেষটা ঘর-করনা অচল দেখে পার্ব্বতীকে বিয়ে করলেন! যাক্ তা'হলে নিরঞ্জনকে আমাদের 'কর্ণধারেরই' কর্ণ ধরিয়ে দেওয়া যাক, আর তোমার উক্ত কার্য্যের জন্য একজন পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দিই গে!"

পরিমল কৃত্রিমকোপে চোখ রাঙ্গাইয়া চাপা হাসির মধ্যে তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আঃ—যাও আমায় যেন সং পেয়েছ!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল তুমি মহীয়ান্,
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ।
—৺ইন্দিরা দেবী

আদিগঙ্গার উপরে ছোট্ট একখানি লালরংয়ের দোতালা রাড়ীর গঙ্গার ধারের উঁচু পাঁচিল ঘেরা ছাদে কয়েকটী ফুলের গাছ টবে সাজান এবং তারই মধ্যে একখানি কাঠের বেঞ্চির উপর বসিয়া একটী মেয়ে সেতার বাজাইতেছিল। টবের গাছগুলি সন্তজলসিক্ত, ভিজামাটীর গন্ধ তখনও বাতাসে মিশিয়া আছে। রজনীগন্ধা, দুএকটা জুঁই এবং কতকগুলি ভুইচাঁপা ও জিনিয়া ফুটিয়াছে। গোলাপের গাছ দুটো আছে ফুল ফোটে নাই।

মেয়েটীর বয়স সতের আঠারোর বেশী নয়। রূপ? তা' নেহাৎ কম ছিল না। সুডৌল গঠন, অথচ ক্ষীণ দেহ, গাত্রবর্ণ সচরাচর যাহাকে বাঙ্গালীর ঘরে ফরসা বলে সেই রকমই। চোক দুটি মাঝারি, নাক, কপাল, ঠোঁট সবই মাঝামাঝি, শুধু চুলগুলিতে বড় বেশী বিশেষত্ব ছিল। —কোঁকড়ান না হইলেও, রেশমের মত নরম, কাকপক্ষ ও তরঙ্গিত। খোলা চুলগুলি বাজনার তালে তালে তাল দিয়া যখন নাচিয়া উঠিতেছিল, তখন অপরাহ্ণের শুক্তি-শুভ্র আকাশের একপ্রান্তে আকস্মিক উদিত প্রাবৃট মেঘের কথা স্বতঃই স্মরণ করাইয়া দেয়। নিরাড়ম্বর বেশ ভূষণে এই সুশ্রী, তন্বী মেয়েটিকে বেশী করিয়াই সুন্দর লাগিতেছে। বাজনা বাজানর সখ মিটিয়া গেলে সে কোলের উপর হইতে যন্ত্রটাকে পাশে নামাইয়া রাখিল, একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলিয়া বেঞ্চির পিঠে পিঠ চাপিয়া একটু আয়েস করিয়া বসিল এবং তারপর গুণ গুণ করিয়া একটা গান আপন মনেই গাহিতে লাগিল। বাজনায় সুর যখন

চড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশের বাড়ীর ছাদে যে তরুণটী প্রত্যহর মত পাঁচিলের ফুকর দিয়া অদৃশ্যপ্রায় মূর্ত্তিটাতে চোখ বুলাইয়া কৃতার্থ হইবার লোভে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বিরক্তমনে সরিয়া যায়, আজও সেতারের সুর তার নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতিতে ত্রুটি রাখে নাই। কিন্তু গানের এ গুঞ্জন সেই উৎসুক পিয়াসীর কর্ণগোচর হইল না। এ শুধু এই পুষ্পবাসিত, নিরালা ছাদটির বুকেই একা একা নিজের সকরুণ মূর্চ্ছনায় গুঞ্জিত রহিল। আপনাকে ভুলিয়া গিয়া বিমনস্কভাবে গাহিতেছিল ;—

"এসো এসো ফিরে এসো, বঁধুহে, ফিরে এসো!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত—নাথহে, ফিরে এসো!
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এসো, ওহে করুণ কোমল এসো,
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত, সুন্দর ফিরে এসো!"

গানের সঙ্গে যখন প্রাণের সংযোগ ঘটে, তখন গানের বাণী বাহিরের শব্দ থাকে না, গায়কের মর্ম্মবাণীতে পরিণত হয়, গান তখন ধ্যানের আসন গ্রহণ করে। এই গায়িকাও তেমনি তন্মনস্ক হইয়া গিয়া বেঞ্চির পিঠে মাথা রাখিয়া এলায়িত দেহে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে পায়ের তালে তাল দিয়া যেন গানের বাণী ভুলিয়া গিয়া প্রাণের ভাষাস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিল,—

"আমার নিতি সুখ ফিরে এসো, আমার চিরসুখ ফিরে এসো ;
আমার, সব সুখ দুঃখ মন্থন করা বাঞ্ছিত ফিরে এসো!"—

এই ছাদে আসিতে হইলে সিঁড়িতে উঠিয়া যে দালানটা পার হইয়া আসিতে হয়, ঠিক সেই সিঁড়ির মাথায় জুতাপরা পায়ের শব্দ হইল। গানের সুরে ও ভাবে মন ছাইয়া থাকায় গীত-কারিণী উহা জানিতে পারে নাই, দেখিয়া, যে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, সে সেইখানেই একটু-ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের বাড়ীর লোকটির মতন চুরি করিয়া গান

শোনার জন্য রহিল, তা মনে হয় না; বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া চলচ্চিত্ত হইয়া ছিল। একবারটী নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইবার জন্যও মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তার সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই প্রমাণ করে। কি ভাবিয়া নিজেকে আবার ফিরাইয়া লইয়া ছাদের দিকেই ফিরিল এবং মনকে আরও একটু শক্ত করিয়া লইয়া সঙ্গীতকারিণীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

বোধ করি একটু শব্দ হইয়া থাকিবে—মেয়েটি তখনই গান বন্ধ করিল। চোক মেলিয়া ও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বসিল এবং মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া চুলের গোছাটাকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া সে মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাটিতে পড়িয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া অতঃপর সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন প্রকার সম্ভাষণের কথা সে কহিল না। মনের মধ্যে একটা বড় রকম ঝড়ের হাওয়া বহিয়া গেল কি না, নিশ্চিত করিয়া কে বলিবে? তবে ওই গানটাই যে সে বিশেষ করিয়া এই সময় গাহিতেছিল, ইহারই জন্য লজ্জায় মুখ তার রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ঘুরিয়া আসিয়া ইহার পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িলেন। ইহারই হস্তচ্যুত বাজনাটা নিজের জানুর উপর তুলিয়া লইয়া বাজনা রাখা জায়গাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া উহাকে আমন্ত্রণ করিলেন, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "বসো।"

মেয়েটী উহার পাশের জায়গাটীতে না বসিয়া তাঁর পায়ের কাছে খালি মেজের উপর বসিয়া পড়িল। তখন নরেশ,—আগন্তুক নরেশচন্দ্র, একবার অনুসন্ধিৎসু নেত্রে উহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণে সেতারে ঝঙ্কার তুলিয়া অনুরোধের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা গাইবে কি?"

মেয়েটীর মুখের উপর কোন ভাবের অভিব্যক্তি ছিল না, যা' ছিল তার মনেই ছিল। মুখখানাকে অমন ভাবশূন্য রাখিতে মনের মধ্যে যে কত খানি বেগ দিতে হইতেছিল, তা' শুধু সেই জানে। তবে সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয় নাই। মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলে নরেশ অনির্দ্দেশ্য-ভাবে তারের উপর মেজরাপ পরা আঙ্গুলীর ঘা দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি গাইবে?"

সে নম্রস্বরে জবাব দিল, "যা' বল্‌বেন।"

"আমি যেটা বল্‌বো সেটাই যে তোমার গাইতে ইচ্ছে হবে, এমন কি কথা আছে? তোমার যে গান ভাল লাগবে তাই গাও না, সুরমা!"

সুরমা ক্ষণকাল মাথা নত করিয়া কি ভাবিল, তারপর মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে গান ধরিল—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা,—
প্রভু! তোমার পানে, তোমার পানে তোমার পানে,—
যায় যেন মোর গভীরতর আশা—
প্রভু! তোমার টানে, তোমার টানে তোমার টানে,—"

গানটা আরম্ভ করিয়াই মনে হইল, এ গানও আজ ইহার সাক্ষাতে না গাওয়াই ভাল ছিল! আধ্যাত্মিক হিসাবে এ সব খুবই বড়, এবং সবারই এদের উপর দাওয়া আছে, কিন্তু মানুষ সব কিছুরই বড়র দিকটার চাইতে ক্ষুদ্র অংশটুকুই যে বড় সহজে দেখে বা দেখিতে চায়। অর্থ-বিকৃতি ঘটাইয়া এই সর্ব্বস্বান্তকর আত্ম-নিবেদনকে যে নিজের ভোগে লাগাইতে না পারা যায় তাও তো নয়! তার চেয়ে সে যদি গাহিত,—

"আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ঘুচাও চোখেরই জলে!"

না, তাহাতেও তার মনের দুর্ব্বলতা হয়ত ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ঘুচিত না।—উপায় নাই!

গান শেষে নরেশ বাজনা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ফুল গাছের টবের দিকে অগ্রসর হইতে প্রশংসাসূচকভাবে বলিয়া উঠিলেন, "ভারি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেচে তো তোমার! সুরমা! তোমার সেই চন্দনা আর কি কথা কইতে শিখেছে? কই সেটাকে যে দেখছিনে?"

সুরমাও তাহার মান্যবান অতিথির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জবাব দিল, "সেটাকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েচি।"

"উড়িয়ে দিয়েছ? ওঃ অসাবধানে উড়ে গেছে বুঝি? সুন্দর পাখীটা ছিল!"

"সুন্দর বলেই তো তাকে কুৎসিত বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিলাম। স্বাধীন হয়ে কি আনন্দেই সে উধাও হয়ে নীল আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল! মনে তার তখন কত আনন্দ হচ্ছিল!"

নরেশ মৌন বিস্ময়ে দু চোখ ভরিয়া সেই এতক্ষণকার নির্ব্বাক এবং এক্ষণে উচ্ছ্বসিতমুখী নারীর সহসা উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার মনের লেখা পাঠ করিয়া চয়ন-করা-এক-গোছা রজনীগন্ধা লইয়া তার একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "সুরমা! স্বাধীন হওয়াই কি সর্ব্বত্র বাঞ্ছিত? স্বাধীনতার মধ্যেও কি দুঃখ নেই?"

সুরমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাথা উঁচু করিয়া জবাব দিল, "আছে, যতদিন না মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস করতে শেখে সে আশঙ্কাও ততদিনের। কিন্তু যদি কোন দেবতার আশীর্ব্বাদ তাকে স্বাবলম্বনের মহৎ শিক্ষায় দৃঢ়করে তুলতে পেরে থাকে—তারপর থেকে অধীন জীবনের লজ্জাই তার বড় লজ্জা হয়ে দাঁড়ায় না কি?"

নরেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অতি মৃদু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস

সন্তর্পণে মোচন্ করিয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আমায় আসতে লিখেছিলে কেন ?"

সুরমা আবার নতমুখী হইল। নরেশের দৃষ্টি হইতে নিজের মুখ সে একটুখানি আড়াল করিয়া রাখিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "এমন করে দিন আমার কাটচে না। একটা কোন উপায় করে দে'বার জন্যই আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি। আমার অপরাধ দয়া করে নেবেন না। যা ভাল হয় কিছু উপায় করে দিন।"

নরেশচন্দ্র ব্যথিত হইলেন। জোর করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক ঈষৎ আবেগ ভরে কহিয়া উঠিলেন, "আমার নির্লিপ্ততা তোমায় দুঃখ দিয়েছে—কিন্তু তুমিই আমার কাছ থেকে সে অধিকার জোর করে কেড়ে নিয়েছ যে সুরমা! আমায় যে তুমি আসতে বারণ করেছিলে।"

সুরমা মুখ তুলিল না। অবনত মুখে চাপাকণ্ঠে সে উত্তর দিল, "ঈশ্বর জানেন, তার জন্য আমি দুঃখিত নই। আপনার অম্লান চরিত্র আমার জন্যে লোকের চোখে আজও ম্লান হয়ে রয়েছে, আর সে দাগ নারায়ণের বুকে ভৃগুপদচিহ্নের মত হয়ত চিরস্থায়ী হয়েই রইলো! আপনাকে ডাকা আমার ঘোর অপরাধ বিশেষতঃ বৌরাণী যদি জানতে পারেন কি ভাববেন তিনি! শুধু নিদ্রা এ'কি সহ্য হয়।

কাজের অভাবে আমার যে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, শুধু তারই একটা পথ করে দিন—আর কিছু চাই না। একটু দিন কাটবার মত উপায়।"

সুরমার সুগভীর নিশ্বাসে অন্তরের উত্তাপ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। নরেশচন্দ্রের চিত্তেও তার বেদনার্ত্ত কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল। এযে কত বড় ব্যথার অভিব্যক্তি, সে কথা তাঁর অজ্ঞাত নয়।

আরও একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, "আমি বুঝি বই কি

বেদানা! তোমার দুঃখ যদি আমি না বুঝতুম, সেই প্রথম দেখার দিনে—এতটুকু মেয়ে তুমি—তা' হলে হয়ত তোমায় আজ আমার এত কাছে এনে দিতে পারতো না। আমি জানি—তোমার দুঃখ আমি জানি। তোমার আত্মত্যাগ সেও যে কত বড়, তাও কি আমি ভুলে গেছি? সে যদি ভুলতে পারতুম, আজ তোমায় চিঠি লিখে, আমায় ডেকে আনতে হতো না। কিন্তু শোন সুরমা! তোমার এই বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা আমি ক্রমাগতই ভেবেছি, কোন কূল পাই নি। অনেকদিন তোমায় বাঁচতে হবে, তার আগে রোগ ও জরার আক্রমণে অক্ষম হয়ে সেবার দরকার হওয়াও বিচিত্র নয়! একটা অবলম্বন না রাখলে চিরদিন তোমার কাটবেই বা কি নিয়ে? কোন একটা পথ তুমি এখনও বেছে নাও।"

সুরমা নীরব রহিল, উত্তর দিল না, দিবার চেষ্টাও করিল না। নরেশের প্রস্তাব কোন পথে গতি লইতেছে,সে তা মনে মনে বুঝিয়াছিল।

নরেশ তার এই নিশ্চেষ্টতা অর্দ্ধসম্মতিবোধে কিছু উৎসাহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমার মায়ের যে ইচ্ছার উপর আমি তোমার শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেম, দেখছি তোমার মনের সঙ্গে ঠিক সেটা সায় দিলে না। তুমি সেদিকে মন দিতে পারচো না, ওস্তাদকেও তো সেই থেকে ছাড়িয়ে দিলে। বাজনাও বন্ধ।"

সুরমা উত্তর করিল, "ভাল লাগলো না।"

নরেশ ক্ষণকালের জন্য সচিন্তিত নীরব থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিতে লাগিলেন, "কিন্তু মানুষ সত্যই কর্ম্মবন্ধন শূন্য ও নিরালম্ব থাকতে পারে না, সে তুমি ক্রমেই তো বুঝতে পারচো? তাই অনেক ভেবেই—যাক্, হিন্দুসমাজ ছাড়া অন্য যে সব সমাজে সমাজবিধির নিয়ম এত কড়া নয়, সেখানের কোন কোন লোকে—"

যে কথাটা নরেশচন্দ্রের জিভের আগায় আটকাইয়া পড়িতেছিল, সেটা শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। অকস্মাৎ উচ্চ এবং মর্ম্মভেদী-কণ্ঠে, "আপনি এই কথা বল্লেন!" এইটুকু বলিয়া উঠিল এবং তারপরই তীরবেঁধা ঘুরিয়াপড়া পাখীর মত স্খলিতপদে সুরমা প্রায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। তার বুক চিরিয়া কণ্ঠ ভেদ করিয়া একটা উদ্দাম ক্রন্দন পার্ব্বত্য ঝরণার বেগে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে আর যে কোনক্রমে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

নরেশচন্দ্র অপরাধীর মত মাথা নত করিয়া একাকী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর বুকের ভিতরটা গভীর ব্যথায় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। অ-বিস্মৃত স্মৃতির চাপা আগুন যেন পুনর্বহ্নিমান হইয়া উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কহিলা তাপস চাহি মোর মুখে—কোন দেব আজি আনিলে দিবা ?
তোমার পরশ অমৃত-সরস তোমার নয়নে দিব্য বিভা !

—কাহিনী

আট বৎসর আগের কথা ;—বর্ষার ঝিপ্ ঝিপে বৃষ্টি কাদায় রাস্তা ঘাটের দুর্দ্দশা যেমন হইতে হয় হইয়াছে। আকাশে ঘোলাটে মেঘ, চলনামা-গঙ্গা জলের মতই তারও যেন কর্দ্দমাক্ত ময়লা রং। সূর্য্যের দেখা শোনা পাওয়া ভার ! রাত্রে চাঁদ তারা যে কত দিনই ওঠেন নাই তার হিসাব ছিল না। এই রকম সময়ে একদিন চাঁপাতলার গলির মোড়ে একখানা মোটর গাড়ী কষ্টে স্যৃষ্টে প্রবেশ করিল, কিন্তু প্রবেশপথেই তার কল বিগড়াইয়া গেল, সে আর চলিল না। গাড়ীর আরোহী দুজন ইহাতে বিরক্ত হইয়া কিছুক্ষণ পাঞ্জাবী সোফারের সঙ্গে বকাবকি করিলেও, নিরুপায়ে নামিয়া পড়িতে হইল।

দুজনের মধ্যে একজন অপর জনকে বলিলেন, "ওহে ননি ! আজ আর গান শোনা হলো না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে এসো সিনেমা ঘুরে আসা যাক।"

ননী একটু ক্ষুন্ন হইয়া কহিল, "তার গানের খ্যাতি শুনে আপনি তার গান শুনতে আসবেন, এ খবর আমি যে পাঠিয়েছি। নসিরণ বিবি আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। আমি তাকে খবর দিয়েছি, থিয়েটারে তোমার গান রাজা বাহাদুরকে মুগ্ধ করেছে।"

'রাজা বাহাদুর' অপ্রসন্ন ভ্রুকুটী করিলেন, বলিলেন, "তা বলে তো আর কাদা মাখামাখি হয়ে যেতে পারিনে ! তা' ভিন্ন অত সব বস্তুতেই বা তুমি গেলে কেন ? গান অবশ্য ভালই লেগেছিল, যেদিন হয়

একদিন শুন্‌লেই চল্‌তো। বিশেষতঃ ওদের বাড়ী গিয়ে গান শুন্‌তে আমার কেমন প্রবৃত্তি হয় না।"

আর কি বলিতেছিলেন বলা শেষ হইল না, পথিপার্শ্বের কর্দ্দমাক্ত অন্ধকার হইতে, কে' বলিয়া উঠিল, "বাবু! বাবু মশাই! গান শুনবেন?"

নরেশচন্দ্র কি বলিতেছিলেন ভুলিয়া গিয়া মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া কহিয়া উঠিলেন, "ওই শোন ননীলাল! গান শুনাবার লোকের অভাব, যে গলির কাদা ভাঙ্‌তে হবে? গান স্বয়ং এসেই আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্চে!—কই, কে' গান শোনাতে চাইছিলে গো? এসো না, গান শোনাবে এসো।"

মোটর গাড়ীর পাশ কাটাইয়া অন্ধকার গলির ওধার হইতে একটি ছোট্ট মেয়ে এধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটীর পরণে একখান সন্তোষপুরের ডুরে, গায়ে একটি ঢলঢলে সিল্কের জ্যাকেট, এক হাতে কাঁচের ঝুরো চুড়ি, কপালে তেলেজলে চকচকে চুলে পাতা কাটা, তার নীচে একখানা মস্তবড় গুলপোকার টিপ। বয়স আট বছরের বেশী মনে হয় না। পাতলা ও অপুষ্ট দেহ, কিন্তু রংটুকু ফুটফুটে, মুখখানিও ভাল।

এই বৃষ্টির রাত্রে জনবিরল অপরিচ্ছন্ন গলির মধ্যে একা এমন সুসজ্জ একটি ছোট্ট মেয়েকে গান শুনাইতে ব্যগ্রতার সহিত উদ্যত দেখিয়া নরেশচন্দ্র বিস্ময় বোধ করিলেন। সাজ পোষাক চেহারায় নেহাৎ ভিখারীর মেয়ে বোধ হয় না। এমন করিয়া সে পথের মধ্যে গান শুনাইতে চাহিল কেন—এই কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মেয়েটী ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! গাড়িতে বসেই গান শুনবেন? না আমার বাড়ী আসবেন?"

ননী এই কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া সকৌতুকে উচ্চহাস্য

করিয়া উঠিল, "ওহে, রাজা! খুকি-মণিটি যে আবার বাড়ীতেও ডাকে হে! ব্যাপারখানা কি?"

নরেশ কিছু ব্যথিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কতদূর? তোমার গান শুন্‌লে তোমাকে কি কিছু দিতে হয়?—না অম্‌নি গান শুনাও?"

ননীবাবুর উপহাসে মেয়েটীর চোখে জল আসিয়াছে, তাহা নিকটস্থ পথের আলোয় দেখা গেল, সে ঢোক গিলিয়া গিলিয়া সেই চোখের জলটাকে দমনে রাখিল ও কাঁপা ঠোঁটে জবাব দিল, "অম্‌নি তো শোনাইনে, পয়সা দিতে হয়।"—ক্ষীণ কণ্ঠে ইহা বলিয়াই তারপর হঠাৎ যেন চমক-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "অ-বাবু! আসুন না, গান শুনবেন—আসুন না—আমি খুব ভাল গান গাইতে পারি। আপনার দিব্যি—সত্যি বলচি!"

ননী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনশ্চ বন্ধুকে সম্বোধন পূর্ব্বক ইংরাজী ঝাড়িল, "হোয়াট এ লিট্‌ল উইচ সি ইজ!" তারপর সেই মেয়েটিকে বলিল, "এই বয়েস থেকেই খুব তো তৈরি হয়ে উঠেছ দেখছি! ঘরে তোমার আর কেউ আছে না তুমিই?"

মেয়েটী আবার জলভরা চোখে ঘাড় নাড়িল এবং আবার সেই রকম ঢোক গিলিতে গিলিতে অশ্রুজলে ভেজা অস্পষ্টস্বরে, "আমার মা আছে, —মার বড্ড ব্যারাম"—বলিয়াই দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "তৈয়ারি" এখনও হইতে পারে নাই,—তাহাই যেন ওই রকমে ইহাঁদের কাছে প্রমাণ করিতে চাহিল।

একটী মুহূর্ত্তের মধ্যেই নরেশচন্দ্র সকল অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। কি দারুণ দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াই এই কচি বয়সের মেয়েটী আজ কি

নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের হস্তে নিজেকে ঠেলিয়া দিতে আসিয়াছে, সেই ভয়াবহ কাণ্ডটা যেন একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার মূর্ত্তিতে নরেশের দুই চোখের সাম্‌নে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। এই সমাজ-পরিত্যক্ত পতিত জীবগুলার শেষ দুরবস্থা তাদের পাপের ভরা প্রায় এই রকমেই ভরাইয়া তোলে! কোন পতিতপাবন যদি নিজে আসিয়া এদের একটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন তবেই এর সদুপায় হয়, কিন্তু কোথায় তিনি? করুণায় বিগলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মেয়েটীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কি বেশীদূর? কাছে হয়ত আমি যাব।"

মেয়েটী রুমালে চোখ মুছিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, "ওই বড় বাড়ীটার একতলার একটা ঘরে আমি আর মা থাকি, দূরে যেতে আমার ভয় করে।"

নরেশ তার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলো।"

সোফার বলিল, "রাজা সাহেব! গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে।"

ননী উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাব করিল, "ওহে, এটিকে কিছু দিয়ে দিয়ো, ডালিমের ওখানেই যাওয়া যাক্ চলো।"

নরেশ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়াই অগ্রসর হইতে থাকিয়া সঙ্গিনী মেয়েটীকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি বলতো।"

সে বলিল, "আমার নাম সুরমা—কিন্তু আমায় সব্বাই বেদানা বলে ডাকে।"

"তুমি ক বছরের?"

মেয়েটী বলিল, "ন' বছরের।"

"ন'! তা' কিন্তু মনে হয় না। আচ্ছা গান গেয়ে তুমি রোজ কত পাও?"

সুরমা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর আবার তেমনি সলিলার্দ্র-

কণ্ঠে উত্তর করিল, "এই তিনদিনে এক টাকা বার আনা পেয়েছি, তাতে মার এক শিশি ওষুধ বই হয়নি।"

নরেশ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত কম কেন? একটা গানে কত নাও?"

সুরমা বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, সে এবার তাহা গোপনের চেষ্টা না করিয়াই জবাব দিল, "কত আর নিই, যে যা' দেয়। কেউ শুন্‌তেই চায় না। অনেকে এমন সব বিশ্রী ঠাট্টা করে যে আমার গাইতেও ভাল লাগে না। আজ তাই সারাদিন আসিনি। এখন মার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—তাই এলুম—না হলে—"

মেয়েটী আর কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তার ক্ষুদ্র শরীরটুকু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া অসহ্য দুঃখ জানাইয়া দিতে লাগিল।

পাপের পরিণাম যেমন সচরাচর ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তার অতিরিক্ত কিছু নয়! বয়সে বৃদ্ধা না হইলেও তরঙ্গিনীর রোগে রোগে এমন দশা হইয়াছিল, যে চোখে সে যেন দেখা যায় না! সেঁৎসেঁতে ঘরের মেজেয় ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ বিছানায় কঙ্কাল মূর্ত্তির মত পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। গৃহসজ্জার মধ্যে দু' একটি ওষুধের শিশি, একটা জলের ঘটি ও এক পাশে দু' একটা হাঁড়িকুঁড়ি ও ময়লা কাপড়-চোপড় পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক দুরবস্থাপন্ন গৃহের মধ্যে গৃহস্বামিনীর কন্যা আসিয়া যখন দাঁড়াইল, এই ঘরের গৃহবাসিনীর সহিত তুলনায় তার সাজসজ্জাকে তখন কত বড় যে কৃত্রিম বলিয়াই বোঝা গেল, সে যেন বাহিরে থাকিতে অনুভবও করা যায় না। মেয়ের সাড়া পাইয়া সেই কঙ্কালাবশিষ্টা মুমূর্ষু তার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে প্রবল তীক্ষ্ণ স্বর বাহির করিয়া বন্য জন্তুর অক্ষমতায় হিংস্র গর্জ্জনের অনুকরণে চেঁচাইয়া উঠিল, "পোড়ারমুখি! অলো-পোড়ারমুখি! এরই মধ্যে যে আবার ছুটে চলে

এলি! এবার যদি পয়সা না নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিস তো এই মরতে মরতে উঠেও খেংরার চোটে তোর পিঠের চামড়াখানা তুলে নেবো, জেনে শুনে ঢুকিস্? তোর আবার ভদ্দরআনির অত পটপটানি কেন্‌লা শুনি? লোকে ঠাট্টা করলে ওঁর লজ্জায় মাথা কাটা যায়! ওরে আমার লজ্জাবতী লতারে! এর পরে খাবি কি করে? দাসীগিরি করলেও যে কোন ভদ্দর লোকের ঘরে তোকে ঠাঁই দেবে না, তা জানিস্?"

সুরমা ছলছলে চোখে মায়ের কাছে ঘেঁসিয়া আসিল, অশ্রু গাঢ়স্বরে কহিল, "রাজাবাবু গান শুনতে এয়েছেন।"

"ওমা! তাই বল! আসুন আসুন—কি সৌভাগ্য আমার, যে আমার মতন দীন কুটীরে আজ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো! ওমা—ও বেদানা! আসনখানা এনে রাজাবাবুকে পেতে দাও না, মা! পেতে দাও! আঃ এমন আধমরা হয়েও পড়ে আছি যে, উঠে বসে আপনাদের মতন মহাজনদের একটু সম্বর্দ্ধনা করে নে'বো, সেটুকুও শক্তি আমার পোড়াদেহে নেই।"

নরেশ ও ননীলাল আসন গ্রহণ করিলেন, সুরমার গানও একটার পর আর একটা করিয়া তিন চারটে শোনা হইয়া গেল। গলা শুনিয়া নরেশের তো বটেই, এমন কি ননীবাবুরও আর এই সন্ধ্যাটাকে নিতান্তই ব্যর্থ বোধ হইল না। গান শুনিয়া নরেশ তরঙ্গিনীকে বলিলেন, "সুরমার এমন গলা, ওকে কেন কোন থিয়েটারে দাওনি?"

তরঙ্গিনী ফোঁস করিয়া একটা জলন্ত নিশ্বাস ফেলিল, "দেখুন, রাজা সাহেব! পাপের পথে যতই এগিয়ে গেলুম, পাপের ভারে মন আমার ততই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সুখ খুঁজতেই বাড়ীর বাইরে এসেছিলুম, খুঁজে দেখলুম—তার একটা কণাও পেলুম না! আমার সেই কুঁড়েঘরে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, এই বাড়ীর তেতালাতেও তা পাইনি। তাই

বড় সাধ ছিল ওকে ও পথে আর যেতে দিব না। ওর গলার জন্যে বছর-খানেক আগে থেকেই ওর জন্যে ওরা দর দিচ্ছিল, আমি যেতে দিইনি। কি মনে করেছিলুম জানেন? আমার সব টাকা দিয়ে ওর জন্যে কোম্পানির কাগজ কিনে দোব, তার আয়ে ওর খাওয়া পরা চলবে, আর ওকে খুব গান বাজনা শেখাব। বড় হয়ে ও একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলবে, তাই থেকে ওর নামও হবে, পয়সাও হবে, আর ধর্ম্মও বজায় থাকবে। তা' হলো না। তা' হলো না—কালযোগে ধরে সব গেল ভগবানের ইচ্ছে নয়—হলো না।"

নরেশ এই রূঢ়ভাষিণী নিষ্ঠুর প্রকৃতির পতিতা-মায়ের মনের ভিতরের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সন্তানের হিতৈষণার পরিচয়ে তার প্রতি অনেকটাই সহানুভূতিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার টাকা ছিল, তা'হলে এমন অবস্থা হলো কেন?"

তরঙ্গিনী বলিল, "ঠকিয়ে নিলে মশাই! ঠকিয়ে নিলে! ভদ্রলোক মনে করে শ্যামলাল পাইনের হাতে দশ হাজার টাকা কোম্পানির কাগজ কিনতে দিলুম। সেই টাকা নিয়েই সে ফেরার হলো! উল্টে তার পিছনে পুলিসে ডিটেকটিভে কত রকমে কত টাকাই আমার খরচ হয়ে গেল মশাই! ধনে প্রাণে আমায় মেরে ফেল্লে! তা' যদি ধর্ম্ম থাকেন, তা'হলে একদিন ঐ টাকা নেওয়া তার বেরুবে। ঐ টাকা ওম্‌নি হজম করতে পার্ব্বে না"—আরও অনেক কটূক্তি সে তার অসৎ পথের অংশীদারের উদ্দেশ্যে ফোয়ারার মতই উৎসারিত করিয়া দিল। তারপর মনের জ্বালা, গালির বন্যায় অনেকখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে কথঞ্চিৎ শান্ত-ভাবে পুনশ্চ নিজের কাহিনী ফিরিয়া আরম্ভ করিল। অনেক আড়ম্বরে নিজের সুখ-ঐশ্বর্য্যের দিনের সবটুকু খবর দিয়া মোট কথা সে বলিল, সেই চৌর্য্য ব্যাপারের পর হইতেই মনের অত্যন্ত আঘাতে

বাতজ্বর হয়; তার উপর উকিল বাড়ী, পুলিস থানায় ছুটাছুটি ইত্যাদিতে রোগ বাড়িয়া যায়। উপার্জ্জন বন্ধ—চিকিৎসার খরচ প্রথমে গহনা, শেষে আসবাবপত্র বেচিয়া চলিতে থাকে। কালের ধর্ম্মে গহনা-গুলায় সোনার ভাগ কমই ছিল, বিলাতি সোনা, পাথর, মতি এই সবই কিনিবার সময় দাম লাগে বেশ, বেচার বেলায় সিকি হইয়া যায়। শেষে বেচিতে বেচিতে যখন সবই ফুরাইয়া গেল, কেবল প্রাণটাই বাকি রহিল, ডাক্তার-ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেও পথ্য মেলা পর্য্যন্ত ভার হইল। প্রথম কিছুদিন ধার কর্জ্জ বন্ধু বান্ধবের দয়াধর্ম্মে চালাইয়া—শেষে সে সবও যখন শেষ হইয়া গেল, তখন অনুপায়েই সুরমাকে রোজগার করিতে পাঠাইতে হইল। তাহাকে থিয়েটারে পাঠানই স্থির হইয়াছে, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না। কাঁদিয়া উঠিয়া পা জড়াইয়া ধরে, বলে অত লোকের সামনে গান তার গলা দিয়া বাহির হইবে না—বরং সে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পয়সা আনিয়া দিবে, তবু ওখানে যাইতে পারিবে না।

তরঙ্গিনী বলিল, "দেখুন রাজাবাবু! মেয়েটার ঐ কথা শুনে আমারও কি আর বুক ফেটে যায়নি? আমিই তো ওকে সেই একরত্তি বেলা থেকে পাপকে ঘেন্না করতে শিখিয়ে এসেছি। 'আমার পাপ আমার সঙ্গেই বিদায় হোক, ওকে আমার সে যেন স্পর্শ করে না।—এই যে আমার ঠাকুরের কাছে একমাত্র কামনা ছিল। কিন্তু কি করবো বলুন, পোড়া পেটের দায়ে শেষকালে তাই আমায় করতে হলো। তা আপনি বলুন তো ও রকম ভিখিরীর মতন পথে বার হওয়ার চাইতে এখন থেকেই থিয়েটারে ঢোকা ওর পক্ষে ভাল নয় কি? আপনি বরং দয়া করে ওকে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারকে একটু বলে কয়ে দেন।—দেবেন কি?"

নরেশ সুরমার মুখের দিকে চাহিতেই তার ভয়ত্রস্ত দু'টি চোখের সঙ্গে তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মিলিত হইল। শিশুর মত বালিকা-চক্ষের সেই

ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিটুকু নরেশের পুরুষ চিত্তকে বিপুলবলে আকর্ষণ করিল। আহা! কুপথ অনুসরণে একান্ত অনিচ্ছুক এই অসহায় জীবনটাকে সে যদি আজ তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া যায়, তাহা হইলে সে কি ইহার ভবিষ্যতের সমুদয় পাপ এবং তাপের জন্য কোথাও দায়ী হইবে না? তার বিবেক উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়—তাহাকে—একমাত্র তাহাকেই এর সমস্ত দুর্দ্দশার জন্য—এখানে না হোক, আর এক লোকের সব চেয়ে বড় দরবারে জবাবদিহী করিতেই হইবে। তখন সে বলিবে কি? ঘৃণা করিয়া সে ইহার দিকে চাহে নাই!—এই কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারিবে? ঘৃণা বাস্তবিকই তো ইহাদের তারা করে না! তা' করিলে ডালিমের গান শুনিতে এই বর্ষার রাত্রে বাহির হইয়াছিল কিসের জন্য? অবজ্ঞায় তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম;—এমন কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিতে, লজ্জায় কি মুখ ঢাকিতে ইচ্ছা করিবে না? তিনি যে এর আসন্ন বিপদের ঠিক সন্ধিক্ষণেই তার সবল রক্ষা-হস্তের মধ্যে এই অনন্যসহায়া ভীরু দুর্ব্বল ক্ষীণ হাতখানি টানিয়া আনিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! কেমন করিয়া সে এর এত বড় দুর্দ্দশার মুহূর্ত্তে ইহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? সে তা' পারে না।—মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তো নয়ই, অমানুষ হইলেও নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে কদর্য্য সৃষ্ট কাক, —সেও সহায়চ্যুত কোকিল শিশুকে নিজের কুলায়ে লালন করে, ফেলিয়া দেয় না।

নরেশ একটু পরেই বিদায় লইলেন, আসিবার সময় সুরমার হাতে দশটা টাকা দিয়া তার মাকে বলিয়া আসিলেন, "সময় মত তিনি আবার আসিবেন, তাদের খরচ তিনিই দিবেন, কিন্তু আজ হইতে সুরমা তাঁর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে এবং তাঁকে না জানাইয়া বাড়ীর বাহির হইতে পাইবে না।"

সুরমার বয়স যদি ন'বছর না হইয়া চৌদ্দ হইত তো তরঙ্গিণী বা ননীবাবু একটুও বিস্মিত হইত না। তাহা নয় বলিয়া দুজনেই বিস্ময় বোধ করিল। তখনি কি ভাবিয়া লইয়া পতিতা করজোড়ে কহিল, "কিন্তু আমারও একটি নিবেদন আছে রাজাবাবু! আপনি দেবতা মানেন?"

"কেন?"

"তা'হলে দেবতার নাম নিয়ে শপথ করতে হবে, বেদানাকে আপনি —যতদিন দুজনে বাঁচবেন—ত্যাগ করতে পারবেন না।"

নরেশ কহিলেন, "কথা দিচ্ছি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গগন ব্যবধান, তবুও মনঃ-প্রাণ, না সঁপি যদি বুক না ফাটে!
তাহার নিষ্ঠায় রাখিয়া বিশ্বাস স্বপন ভরে দিন নাহি যায়,
ভাঙিলে সে স্বপন—মরিতে নার যদি—ব'লনা 'প্রেম' তবে কভু তায়।

—তীর্থরেণু

সুরমার মা মাসখানেকের মধ্যেই মরিল। তখন সুরমাকে লইয়া নরেশ বিপন্ন বোধ করিলেন। পতিতা-কন্যাকে নিজের ঘরে রাখা চলে না; অথচ থাকেই বা কোথা? তার শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির যে পরিচয় তিনি পাইতেছিলেন, মমতায় চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এমন জীবনটী যেমন করিয়াই হোক নির্ম্মল রাখিতেই হইবে। পাঁকের মধ্যে জন্মিলেও ইহাকে পঙ্কজিনীরূপে ফুটিয়া উঠিতে সহায়তা করিতেই হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভবানীপুরের প্রান্তে এই ছোট্ট বাড়ীখানি তার নামে কিনিয়া দিলেন। একটী বৃদ্ধ দরওয়ান ও একটী ঐরূপ ভৃত্য রাখিয়া সেই বাড়ীতে এই ভিন্ন জগতের মেয়েটীকে প্রায় বন্দীদশায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঝি ইচ্ছা করিয়াই রাখিলেন না। এর পরিচর্য্যা করিতে রাজী হইবে এমন দরের ঝি, অসৎ শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয় তাদের মত অল্পই আছে।

সুরমার মায়ের সাধ মেয়ে সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তারই চর্চ্চায় ও শিক্ষায় জীবন কাটায়। নরেশের সেটা অসঙ্গত ঠেকিল না। একটা পথ এদের জন্য তৈরি করিয়া না দিতে পারিলে এই বা আশ্রয় পায় কোথায়? আজকাল তো অনেকেই মেয়ে বউদের গানবাজনা শেখান, এদের মধ্যে যারা সুপথে জীবিকার্জ্জন করিতে চায়, তারা তো অন্তঃপুরিকাদের গানবাজনা শিখাইতে পারে। বৈষ্ণবীরা পূর্ব্বে বড়লোকের অন্তঃপুরে মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইত, মিসনরী মেমেদের সঙ্গেও দেশীয় খৃস্চান

মেয়েরা যিশুর গান গাহিয়া ও শেলাইবোনা শিখাইয়া বেড়ায়, তাদের মধ্যেও তো ঢের মন্দ জিনিষ ছিল, ধর্ম্মশিক্ষার ও সঙ্ঘ-মধ্যের শাসন সংযমে তারাও সংযতভাবে চলিতে শিখিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার অধিকার লাভ করিয়াছে। তেম্‌নি এদের লইয়াও যদি একটা কর্ম্মশালা খোলা যায় মন্দ হয় কি ? অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নরেশচন্দ্র ওস্তাদ রাখিয়া সুরমাকে গানবাজনা ভাল রকমেই শিখাইতে লাগিলেন।

হরিধন ঠাকুদ্দা সেতারের ওস্তাদ হইল, ননীবাবু হইল এসরাজের এবং একজন বুড়া হিন্দুস্থানী আসিয়া ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি তানপুরার সঙ্গে যথারীতি শিখাইতে লাগিল। ইংরাজী বাংলা লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও করিলেন। সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া নরেশচন্দ্র ধূলা ময়লা ঝাঁটাইয়া ইহার ভিতরকার খাঁটী সোনাটুকু বাহির করিতে চাহিতেছিলেন। কয়েক বৎসর কাটিয়া গেলে দৈবাৎদৃষ্ট একটী বৃদ্ধ সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে তাঁকেও টানিয়া আনিলেন। মেয়েটীর ভিতরকার আগ্রহ ও সদিচ্ছা সাধুকেও বিগলিত করিল। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া সুরমাকে নীতি এবং তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষা দিতেন। সুরমা তাঁকে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। এমন মহৎসঙ্গ সে যে কল্পনা করিতেও পারে না! তাঁর প্রত্যেকটী কথা সে কান দিয়া পান করিত।

এদিকে কিন্তু বাহিরে বাহিরে নরেশ ও সুরমা সম্বন্ধে অনেক কিছুই রটিয়া উঠিতেছিল। নরেশ—অবিবাহিত ধনী ও নিরভিভাবক নরেশ, একটা কম বয়সের—(সে যে কত কম সে হিসাব রাখিতে কার গরজ!) —মেয়েকে একখানা একান্ত বাড়ীতে রাখিয়া তার উপর বিস্তর খরচ-পত্র করিতেছেন, তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা আসিয়া সেখানে গানবাজনার মজলিস্ জমাইয়া তুলিতেছে;—আবার সে মেয়েও দেখিতে ভাল, গায় ভাল, বাজায় উৎকৃষ্ট।—এসব যোগাযোগের মধ্যে সাধারণতঃ মানব-

কল্পনা কিসের সন্ধান পাইয়া থাকে! চারিদিকে সুরমা সম্বন্ধে যে গুজব রটিল, সে তার একেবারেই অনুকূল নয়! নরেশের বাকি বন্ধু যারা, তারা ননীবাবুদের প্রতি তীব্র ঈর্ষা প্রদর্শন করিয়া নরেশকে তার একচোকোমীর জন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অনুযোগ করিতে থাকিল। নরেশ ব্যস্ত হইয়া সকলকেই অল্প বিস্তর বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাদের কল্পনা ভিত্তিহীন, সুরমা তাঁর আশ্রিতা মাত্র।—সে নেহাৎ ছেলেমানুষ এবং অত্যন্ত নির্ম্মল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া চোখের ইসারা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বেশতো, হোক না সে সতীত্বের—শ্বেতপদ্ম! আমাদের তো তা'তে আপত্তি নেই। আমরা শুধু তার দুটো গান শুনে আসতে চাই বৈতো না, ভয় পাও কেন?"

অগত্যা গান শুনাইতে হইল এবং আরও দুচারবার বিশেষ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পার পাওয়া গেল না। ইহাঁদের মধ্যের দু' একজন গূঢ় রহস্য করিয়া সুরমার সঙ্গে কথা কহিতে যাইতেই নরেশ চোক রাঙ্গা করিয়া চাহিলেন এবং সেই হইতে তাঁদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটিল। সম্পত্তির উপরে প্রবল আধিপত্যের প্রচেষ্টা বোধ করিয়া বাকি সকলে কদাচ সুরমার গান শুনিতে পাইলেও, তাকে অসম্মান করিতে ভরসা করে না, কিন্তু সুরমা সহসাই একদিন নিজের সম্বন্ধে লোকমতটা ভালরূপেই জানিতে পারিল।

সাধুটী বদরিনাথ ইত্যাদি তীর্থভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন। সুরমার বয়স এখন ষোড়শ পরিপূর্ণ। ননীবাবু ও হরিধন আজও সপ্তাহে একদিন বাজনা শিখাইতে আসে। ওস্তাদজী একদিন অন্তর। কিন্তু সুরমার মনটা আজকাল বড় শূন্য বোধ হয়। নরেশ ইদানীং বেশী আসাযাওয়া করেন না। আসিলেও তেমন যেন প্রাণখোলা ভাবে না মিশিয়া গানের বুলিই শুনিয়া যান এবং গানের শেষে সবার সঙ্গেই, কোন

দিন সকলের আগেই উঠিয়া, নিঃশব্দে প্রস্থান করেন। সঙ্গত হোক আর অসঙ্গতই হোক, সুরমার প্রাণ ইহাতে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এই কার্য্য কারণের সন্ধান একদিন মিলিয়া গেল। কালীঘাটে মহিলা সমিতি। স্বদেশী সম্বন্ধে কোন ভদ্র মহিলা কি বক্তৃতা করিবেন। নরেশকে পত্র লিখিয়া তাঁর অনুমতি লইয়া সে সেই সমিতিতে গেল। সে যেখানে বসিয়াছিল, কমবয়সী কতকগুলি বৌ ঝির সেইখানে সমাবেশ হইয়াছে, তাদের মধ্যে কেহ কেহ তার সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। একজন অপরকে বলিল, "দেখেছিস্ ওর মুখের সঙ্গে আমাদের ছোট বৌদির একটু যেন আদল আসে! কে' ভাই ও?"

"জ্যাকেটটির ছাঁট তো বড় সুন্দর! জিজ্ঞেস্ কর্ না, কাদের বাড়ীর মেয়ে না বউ?"

"ওমা, বউ কি বলছিস। সিঁতেয় নাকি সিঁদুর আছে! জান্না ভাই—ও কে?"

অবশেষে জানাজানি হইল। সুরমা উহাদের প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত হইয়া স্বীকার করিল, তার বিবাহ হয় নাই, তার বাপকুলের কেহ নাই। তার বাপের নাম জিজ্ঞাসায় সে নিরুত্তর রহিল। তারপর কার কাছে থাকে জিজ্ঞাসায় সে যখন বলিল, একাই থাকে, তখন সেই তরুণী মেয়েরা যেন দিশেহারা হইয়া পড়িল। একটী মেয়ে বুদ্ধি করিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমরা কি ভাই ব্রহ্মজ্ঞানী? তাদের ঘরের মেয়েরা মেমেদের মতন পড়াশোনার জন্যে বোর্ডিং টোর্ডিং-এও তো থাকে শুনেছি। সেই রকমই কি এখানে এসেছ?"

সুরমা ম্লান ও বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িল।

এই সময়েই একটী প্রৌঢ়া উহাদের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হইয়া সাম্‌নে আসিয়া সুরমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেখি কার

পরিচয় শোধান হচ্ছে! ওমা! এ যে ওই ‘সুরম্যকুটিরে’র সুরমা গো!—অবাক্ কল্লি তোরা! ও আবার নিজের পরিচয় দেবে কি? চল্ চল্ ওদিকে গিয়ে বস্‌বি চল্। ছুঁড়িগুলোর যদি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান আছে! হরি বলো মন!—”

নিজেদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাবটা কোথায়, ভালমতে বুঝিতে না পারিলেও কোথাও যে ঘটিয়াছে, সেইটুকু বুঝিয়া লইয়া অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণা তরুণীর দল দুম্‌দাম্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং ঝুন্‌ঝুন্ শব্দে অলঙ্কার বাজাইয়া সভামণ্ডপের অপর প্রান্তে চলিয়া যাইতে যাইতে পূর্ণ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন গা! ওকে কি আপনি চেনেন?”

প্রৌঢ়া হাতমুখ নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিলেন, “ওমা, তা’ আর চিনিনে! ও যে কোথাকার এক খেতাবী-রাজার রাখা-মেয়েমানুষ। ওর সঙ্গে কি ভদ্দর ঘরের মেয়েদের কথা কইতে আছে মা?”

সুরমার মনে হইল, তার চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। আলোকময় জগৎ যেন মুহূর্ত্তে তমসাবৃত হইয়া গেল!

নরেশচন্দ্রও কিছুদিন হইতে এই সম্বন্ধীয়-জ্বালায় নেহাৎ কিছু কমও ভুগিতেছিলেন না। বন্ধু বান্ধবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও সুহৃদ্ ও হিতকামীর দলও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অল্প বিস্তর ভৎর্সনাপূর্ব্বক এই সর্ব্বনেশে নেশার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। দেশ হইতে বিমাতা রত্নাবলী হঠাৎ এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—মর্ম্ম তার এইরূপ;—‘বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম তুমি একটা পতিতার সঙ্গ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছ। তাহার পায়ে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছ। তাকে রাণীর বাড়া করিয়া রাখিয়াছ। এ সব কি ভাল? অবশ্য

তোমাদের মত বড় লোকের ঘরে সবই সাজে। তথাপি বিবাহ না করিয়া শুদ্ধমাত্র হীনসঙ্গে কাটাইলে চলিবে কেন? তুমি বংশের এক সন্তান, বংশরক্ষা করা ত চাই। ও সব যা' আছে, নেহাৎ ছাড়িতে না পারো থাকুক, কিন্তু বিবাহ না করিলে চলিবে কেন?' যদি তোমার মত হয় আমার বোনঝি চামেলীর সঙ্গে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করি। চামেলীকে ছোটবেলায় বোধ করি দেখিয়াছ? বড় হইয়া আরও সুন্দরী হইয়াছে। দিব্য ডাগর মেয়ে, তোমার সঙ্গে অসামঞ্জস্য হইবে না?

এই চিঠি পাইবার পর নরেশের দ্বিধাগ্রস্ত মন সম্পূর্ণরূপেই নব চিন্তাধারার অনুবর্ত্তন করিয়া সঙ্কল্প-দৃঢ় হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী সুরমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, ইহাই তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ধ্যাবেলা একাকিনী সুরমা বসিয়া অর্গানের বাজনার সঙ্গে নিজের মধুর কণ্ঠের যোগ করিয়া গাহিতেছিল;—

"ওহে জীবনবল্লভ! ওহে সাধন-দুর্ল্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব।
শুধু নীরবে যাব, হৃদয়ে লয়ে প্রেম মুরতি তব।"

হঠাৎ খুব কাছেই জুতা-পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেশ।

তৎক্ষণাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল, হাঁটু গাড়িয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল।

নরেশ ব্যগ্র হইয়া বারণ করিলেন, বলিলেন, "বেশ মিষ্টি লাগছিল। প্রণাম নে'ওয়ার চাইতে গান শুন্‌তে আমি অনেক বেশী ভালবাসি।—যা গাচ্ছিলে গাও, শুনি।"

সুরমা আজ্ঞা পালন করিল। গাহিতে তার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। সে প্রাণের পূর্ণ দরদ দিয়া গাহিতে লাগিল;—

"সুখ দুঃখ সব ত্যজ্য করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা দিবে তাহা মাথায় তুলে লব।"

গান থামিলে তার দিকে—একটু নত হইয়া নরেশ কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "নিজে হাতে 'যা' দেব, তাই মাথায় তুলে নেবে' কি? 'তোমার মর্ম্মের কথা' আমি না জানি তা' নয়; আজ 'আমার মর্ম্মের কথা' আমি তোমায় জানাতে এসেছি, তুমি শুন্‌বে কি বেদানা?"

সুরমা এমন সুর এঁর গলায় কোন দিন শুনে নাই, আবার সেই সঙ্গে এই সব কথা! সে ত্রস্ত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া তাঁর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল।

নরেশ তাহা বুঝিয়া কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন ও তার দৃষ্টি হইতে নিজের দৃষ্টি সরাইয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমায় ভালবাসি।"

সুরমা দুই হাতে সবেগে মুখ ঢাকিল। নরেশ দেখিলেন সে হাত দুখানা কাঁপিতেছে। তিনি দুই হাতে তার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অনেকদিন থেকেই তোমায় আমি ভালবেসেছি। দূরে সরে যাবার চেষ্টা কর্‌ছিলাম, পার্‌লাম না। তুমিও তো আমায় ভালবাস—আমার হও।—আমি তোমায় চাই।"

সুরমা জোর করিয়া তাঁর হাতের মধ্য হইতে নিজের মুখ ছিনাইয়া লইয়া পিছু হটিয়া বারেকমাত্র তার শান্ত সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ দৃষ্টি দীপশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ললাটের শিরা স্ফুরিত হইয়া নেত্রতারকা উল্কাবিন্দুর মত দীপ্তি প্রাপ্ত হইল, কিন্তু সে একটী মুহূর্ত্তের জন্য! পরক্ষণেই অবসন্নভাবে নরেশের পায়ের তলায় জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া সে একান্তরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দুটি হাত জোড় করিল, "আপনার আদেশ লঙ্ঘন করবার সাধ্য আমার নেই;—

কিন্তু ইহলোকে আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়—আমার দেবতা! আপনার প্রতি শ্রদ্ধা হারালে কি নিয়ে আমি বাঁচবো?" —বলিতে বলিতে থর থর করিয়া বায়ুতাড়িত পুষ্প-পেলবের ন্যায় দুখানি ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, ঝর ঝর করিয়া চোখের জল পাতায় জমা শিশিরের মত ঝরিয়া পড়িল।

নরেশ এ কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি আমায় ভুল বুঝেছ বেদানা! তেমন করে তোমায় আমি পেতে চাইনি। তোমায় আমি বিয়ে করবো।"

বিদ্যুৎছটার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুরমা এবার উচ্চকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপনি আমায় বিয়ে করবেন? আমাকে? নিশ্চয়ই আপনার মাথার ঠিক নেই। কিম্বা—"

নরেশ মনের মধ্যে ঈষৎ লজ্জানুভব করিলেও তাহা গোপন রাখিয়া সপ্রতিভভাবে হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি পাগলও হইনি—নেশাও করিনি। সহজ স-জ্ঞানে প্রস্তাব করচি এবং এ সম্বন্ধে আমার সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে।"

শুনিয়া সুরমার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। সে তার শানিত ছুরিকার মত উজ্জল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নরেশের আবেগময় নেত্রের উপর স্থির করিয়া তেমনি নির্ম্মলকণ্ঠে জবাব দিল, "কিন্তু আমি আপনার প্রস্তাব গ্রহণ কর্ব্বো না। আপনার স্ত্রী আমি হতে চাইনে!"

নরেশের মুখের ছবি বিস্ময় ও বেদনাহত হইয়া উঠিল, আহত স্বরে—"সে কি!—সুরমা! তবে কি আমায় ভালবাস না তুমি?" বলিয়া উঠিলেন।

বন্দুকের গুলি খাইয়া ছোট্ট পাখী যেমন করিয়া ঘুরিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া মুহ্যমানা সুরমা আবার নরেশের পায়ের তলায় ফিরিয়া বসিয়া

পড়িল। অনাহুত চোখের জলকে প্রাণপণে রোধ করিতে করিতে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে সে কহিল, "আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত কিনা ভগবান জানেন! কিন্তু জ্ঞানতঃ আমার শরীর মন দিয়ে এজন্মে আমি কোন পাপ করিনি—তাই মনের মধ্যে আপনার পূজো করা আমার পক্ষে দুঃসাহস বোধ করলেও পাপ করেছি, ভাবতে পারি না। আপনি আমার দেবতা—আমার দেবতারও বাড়া—আমার পরমেশ্বর। আপনাকে মিথ্যা আমি কেমন করে বল্‌বো—যদি কখন জন্ম বদলে মানুষের দেহ—মেয়েমানুষের দেহ—আবার পাই, তবেই তা' আপনাকে দিতে পারবো—এ পাপ দেহ—আমি একে কেটে কুচিয়ে ফেলবো—তবু আপনার পায়ে দিতে পারবো না।"

নরেশচন্দ্র এই গভীর বেদনাপূর্ণ আত্ম-প্রকাশে গভীরতর সহানুভূতি ও ব্যথানুভব করিলেন। নত হইয়া সুরমার একখানি হাত হাতে লইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ আদরের সহিত কহিয়া উঠিলেন, "তোমার দেহ, পাপ দেহ কিসে সুরমা? কোন পাপই তো এ শরীরে তুমি করোনি। তবে কেন অন্যের পাপের কলুষে নিজেকে তুমি কলুষিত বোধ করচো? জন্ম সম্বন্ধে তোমার হাত ছিল না, তোমার যা' সাধ্য তা'তে তুমি উচ্চ সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছ!"

সুরমা নিজের হাত সেইভাবে নিবদ্ধ থাকিতে দিয়া, মর্ম্মপীড়িতের ব্যাকুল বেদনার বিলাসপূর্ণ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আপনি ভুল করেচেন! আমার এ দেহ পাপ প্রসূত, পাপ পুষ্ট এই শরীর দিয়ে আমি আর সব হতে পারি, শুধু গৃহস্থের বউ, আর—" সুরমা নীরব হইল!

নরেশ তার হাতে সজোরে চাপ দিয়া অধীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, "আর?"

জোর করিয়া দ্বিধাশূন্য হইয়া সুরমা নতনেত্রে উত্তর করিল,

"সন্তানের মা হতে পারি না। সমাজের-বাইরে দেশের, দশের, ধর্ম্মের, কর্ম্মের, আরও অনেক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে আপনারা আমাদের নিয়োগ করে আমাদেরও বাঁচান, আর নিজেরাও বেঁচে থাকুন। ড্রেনের ময়লা তুলে অন্তঃপুরে নেবেন না। কা'র মধ্যে কতখানি বিষ থেকে যায়, তার কি স্থিরতা আছে!"

নরেশ অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া সুরমা আরও একটু জোর দিয়া বলিতে লাগিল, "যেমন ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী বা পুরুষের বিবাহ করা অনুচিত এবং দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্তদের বিয়ে করা মহাপাপ, তেমনি আমাদেরও এই বিষাক্ত শরীরের রক্ত দিয়ে জীব সৃষ্টির মত মহাপাতক আর নেই! আমার মায়ের রক্ত আমার মেয়ের মধ্যে যদি—"

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুরমা দু হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।—"আর বলবেন না, আমি পারচি না, হয়ত দুর্ব্বল সামান্যা স্ত্রীলোক—লোভে পড়ে যাব! কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার সন্তান আমার রক্তের দোষে হয়ত—হয়ত—হয়ত ঐ পাপপথে ঐ হীন বৃত্তিতে —ওঃ ভগবান! ভগবান! এমন যেন না হয়!"

সুরমার সুগভীর হতাশার মর্ম্মান্তিক বিলাপ, মর্ম্মের একান্ত প্রাণ-ফাটা অসহায় আর্ত্ততার মধ্যে মিশিয়া অস্ফুট হইয়া গেল। দু' হাত-দিয়া-ঢাকা মুখ সে নিজের দুই জানুর মধ্যে লুকাইল।

সুরমা চাহিয়া দেখিল না; কিন্তু তারই অঙ্কিত এই ভয়াবহ চিত্র নরেশের বুকের মধ্যেও বোধ করি একটা সংশয়ের আঘাত হানিয়াছিল। তাঁর এতক্ষণকার সতেজ দৃষ্টি ও সুদৃঢ় ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে একটা সন্দেহাকুল চলচ্চিত্ততা জাগিয়া উঠিয়াছে।

কতক্ষণই এভাবে কাটিয়া গেল। দেয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙ্গান ছিল। তার পেণ্ডুলেমটা একটা ভ্রমরের গঠনের একটা পদ্ম ফুলের কাছে

সেই ভ্রমরটা ক্রমাগত ডানা মেলিয়া আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু যেন প্রত্যাখ্যাত হইয়া বারে বারেই ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহারই ব্যাকুল আবেদনের সুরে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল।

তখন যেন নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়া নরেশচন্দ্র সুরমার দিকে চাহিয়া ডাকিলেন, "বেদানা!"

"আজ্ঞে?"

"কিন্তু সুরো! দুটো জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষটা কি একেবারেই তুচ্ছ? এ বিয়েতে আমরা দুজনে কত সুখী হতেম, সেটাও ভেবে দেখ।"

সুরমা হয়ত এই কথাটাই তখন ভাবিতেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "এ বিয়েতে আপনাকে স্বজনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে হবে, সমাজে হেয় হতে হবে, আর তা' ছাড়া সবচেয়ে বড় যা' তাতো আগেই বলেছি! এ অবস্থায় যে সত্যকার ভালবাসে, সে কি কখন সুখী হতে পারে?—না লজ্জা ঘেন্নায় মরে যায়? কেমন করে জানলেন যে দুজনেই সুখী হবো?"

"তাহলে কি তোমায় চিরদিন এই অমর্য্যাদার মধ্যে ফেলে রেখে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য এই তুমি স্থির করেচো?"

"আমার জন্যই যে অমর্য্যাদার মধ্যে আপনি এত করে কি তার বদল করতে পারলেন,—যে আরও আশা করচেন? লাভে হ'তে—এখন যেটাকে 'পুরুষোচিত দুর্ব্বলতা' বলে লোকে আপনাকে অন্ততঃ ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে চলে, তখন তা' করবে না। আর আমি? আমি লোকের চোখে যেমন আছি তাই থাকবো। শুধু তারা ঘৃণার সঙ্গে এই কথা বলে আমার সান্নিধ্য ছেড়ে সরে যাবে,—যে, 'ওটা এতদিন রাজা নরেশচন্দ্রের, নরেশচন্দ্রের—" যে লজ্জাকর শব্দটা মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছিল না,

তার দুশ্চেষ্ট অধ্যবসায় হইতে উহাকে মুক্তি দিয়া নরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তোমার কথাই হয়ত ঠিক!"

সুরমা মুখ তুলিয়া বলিল, "একটী ভিক্ষা চাইবো?"

নরেশ শুধু ম্লানমুখে চাহিয়া রহিলেন, প্রশ্ন করিলেন না।

সুরমা কহিল, "আপনাকে খুব শীঘ্র বিয়ে করতে হবে। আর যত দিন না আপনি আপনার সেই স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন, ততদিন আমায় দেখা দেবেন না।"

নরেশ একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক ভারাক্রান্তচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, "তাই হোক্।"

দুজনে পাশাপাশি অর্দ্ধ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। রাত্রি তখন গভীর হইয়াছে। উঠানভরা চাঁদের আলো যেন থমথমে নিঝুম হইয়া মৃতদেহের মত সাদা চাদর ঢাকা পড়িয়া আছে। অঙ্গনের এক পার্শ্বের পেয়ারা গাছে একটা পাখী প্রস্ফুট চন্দ্রালোককে দিবালোক ভ্রমে ঘুমভাঙ্গা ভাঙ্গাগলায় মিনতি করিয়া বলিতেছিল, "কথা কও! কথা কও!—"

বহির্দ্বারের কাছে আসিয়া হঠাৎ সুরমা দাঁড়াইয়া পড়িল, নরেশচন্দ্র নিতান্ত বিমনা থাকিলেও তার আকস্মিক অচলতা তিনিও অনুভব করিলেন। চলা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কাছে আসিয়া তাঁর পায়ের কাছে নত হইয়া সুরমা হঠাৎ কান্নাভরা দীর্ঘশ্বাসের সহিত দ্রুত কহিয়া উঠিল, "অত্যন্ত লোভ হলেও বড় হয়ে পর্য্যন্ত কখনও আপনাকে স্পর্শ করে আপনার পায়ের ধূলো আমি মাথায় নিতে সাহস করিনি। শুধু আজকের মতন একটীবার আমায় সেই অধিকারটুকু পেতে দিন। স্পর্দ্ধা আমার এই একটী দিন মাপ কর্ব্বেন!"

এই বলিয়াই অনুমতির অপেক্ষা মাত্র না রাখিয়া সে উপুড় হইয়া

উহাঁর দুই পায়ের উপর মাথা রাখিল এবং বহু বিলম্বে মাথার চুলে মুছিয়া জুতার তলা হইতে ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ তার মুখ দেখিতে পাইলেন না, দেখিতে চেষ্টাও করিলেন না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, একটা প্রিয়বাক্য, একটা আশীর্ব্বাণী কিছুই তাকে প্রদান করিলেন না।

এর মধ্যে সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদিন পরে এই দেখা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আশা রেখো মনে, দুর্দ্দিনে কভু নিরাশা হ'য়োনা ভাই,
কোন দিনে যাহা পোহাবে না, হায়, তেমন রাত্রি নাই!
রেখো বিশ্বাস, তুফান বাতাসে, হ'য়ো না গো দিশাহারা,
মানুষের যিনি চালক, তিনিই চালান চন্দ্র তারা।
রেখো ভালবাসা সবার লাগিয়া ভাই জেনো মানবেরে,
প্রভাতের মত প্রভা দান করো, জনে, জনে, ঘরে ঘরে।

—তীর্থরেণু

মহানগরী সুপ্তিমগ্ন। কর্ম্ম কোলাহলময়ী রাজধানীর মধ্যে এক্ষণে কদাচিৎ একটা শব্দ শোনা যায়। পথ প্রায় জনহীন; ভাড়াটে গাড়ী কচিৎ ও দু'একখানা রিক্সা ষ্টেশনের পথে বাহির হইয়াছে, অথবা ফিরিতেছে। একটা মাতাল কোথাও স্খলিতপদে গ্যাসপোষ্টে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। একটা পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী এবং হাতের 'বেটন' এক বার দেখা গেল, সেজন্য অন্ধ গলির কোকেনের দোকানে ব্যস্ততা দেখা গেল না।

খড় রাস্তার উপরকার প্রায় সকল দোকান বন্ধ, একখানা ময়রার দোকানে তখনও আলো জ্বলিতেছে এবং তাড়ু চালানর খরখরানি শোনা যাইতেছে। আচম্কা একখানা মটর সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, ভিতরকার নরনারীদের হাস্যকৌতুক অকস্মাৎ একবার ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। কদাচ ষ্টেথিস্‌কোপ ঝুলানো কোন ডাক্তার বিশেষ কোন রোগীর জন্য আহূত হইয়া ছুটন্ত মটরে বসিয়া আছেন দেখা গেল।

বড় বড় সাহেবী হোটেলের সাম্‌নে গাড়ী মোটর তখনও জমিয়া আছে। উর্দ্দিপরা তন্দ্রাচ্ছন্ন আর্দ্দালীরা সোফারের পাশে মুনীবদের প্রতীক্ষারত।

আরও এক শ্রেণীর মধ্যে মধ্য-রাত্রির শান্তিময়তা অনভ্যর্থিত। কোথাও কোথাও দুএকখানা গাড়ী মোটরও দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেগুলা আন্তর্জ্জাতিক অর্থাৎ ইংরাজ, বাঙ্গালী, মাড়ওয়ারি, ভাটিয়া সর্ব্ব সাম্প্রদায়িক।

গঙ্গাতীরে এখন কল কারখানা ও ষ্টীমার ষ্টীমলঞ্চের ঝক্‌ঝকানী ফোঁস্‌ফোঁসানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নদী তীরের আফিস বাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ, নিরালোক এবং নিস্তব্ধ। সারাদিনের কঠোর শ্রমের পর যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যগুলা তাদের বিপুল দেহগুলাকে যেখানে সেখানে মেলিয়া দিয়া ঘুমে এলাইয়া পড়িয়াছে। কে' জানে কখন বাঁশীর উৰ্দ্ধস্বরে সারা সহরকে চকিত করিয়া জাগ্রত হইবে!

নিরঞ্জন দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া আসিল। এক পাশে বিপুলায়তন গড়ের মাঠ, হীরক ও মরকতমণির মালা গলায় দিয়া ঘুমাইতেছে। 'অপ্সরজাতীয়' নরনারীর রূপের আলো, পোষাকের চমক সেখানে এখন আর নাই! ইংরাজের-'স্বর্গোদ্যান' নিস্তব্ধ। 'কিন্নরের' কণ্ঠরব শ্রুত হইতেছিল না। গন্ধর্ব্বলোকের সকল জাঁকজমক ঘুমের কোলে চাপা পড়িয়াছে। কেবল জলের বুকে জাগিয়া আছে, নৃত্যশীল তারার মালা, আর একখানা মহাজনী নৌকার বুকে জাগিয়া জাগিয়া একটা চাটগেঁয়ে মাঝি তাললয়বিহীন এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃজন-তৎপর রহিয়াছে। নিরঞ্জন উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া গীতাংশ উপভোগ করিল—

"আমি ন্যাথলাম সব, ঠিক দিত্যে প্যারল্যাম নারে, এ এ এ! ভ্যাক্ লেলাম, বৈরাগী হল্যাম, ও পোরা মন হিস্তাব নেক্যাস ঐলো না, রে এ?"

রস ইহাতে থাক না থাক, নিরঞ্জনের অন্তরের পিপাসায় যেন

বারিপাত হইল! পশ্চিম বঙ্গের নিকটে উপহসিত উহাদের পক্ষে কিছু কষ্টর্ব্বোধ্য ভাষায় জনসম্পর্কশূন্য নিঃসঙ্গ রাত্রে নিরক্ষর মাঝির নিজস্ব মনোভাবটী—কাহারও কাছে নয়—শুধু নিজের কাছেই সে প্রকাশ করিতেছিল। নিরঞ্জনের বোধ হইল উহার ভিতর দিয়া, সে যেন সাহেবের অফিস হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছে! এই উচ্চারণের বৈসাদৃশ্য, এই শব্দ বিকৃতি, এ যে তার বুকের মণি! এই যে তার মায়ের দান! সে কাঙ্গালের মত উৎকর্ণ হইয়া রহিল কিন্তু গায়কের তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর শুধু 'রহিয়া রহিয়া ঐটুকুকেই ফিরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল। গান আর অগ্রসর হইতে পাইল না।

নিরঞ্জন কিনারায় কিছুক্ষণ পাইচারী করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। ততক্ষণে চাটগেঁয়ে মাঝির সঙ্গীত-সাধনা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণভাবেই সমস্ত চরাচর নিঝুম নিস্তব্ধ নিদ্রিত। নিশান্তের তারাগুলাও যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছিল। গঙ্গার জল মূর্চ্ছাতুরের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

নিরঞ্জন একটা নিশ্বাস ফেলিল, আপনাকে আপনিই বুঝাইতে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "কিছুতেই ভুলতে পারচিনে কেন? মন কেন স্থির হচ্চে না? আমি তো তার ভালই চেয়েছিলেম, আমার সেবা করতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে গেল, এতে আমার তো হাত ছিল না। তবে কেন নিজেকে তার হত্যাকারী বলে মহাপাপীর মনের মতন জীবন দুর্ব্বহ করে তুলছে? চারিদিকে তারই ছায়া দেখ্‌ছি, তার স্বর নিয়ত কানে বাজ্‌চে, এ'কি হলো আমার? কালীপদ! বন্ধু! তোমার শেষ অনুরোধ রাখতে পারি নি বলেই কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? চেষ্টা তো করেছিলুম, বিয়ে করবো, সুখে রাখবো সেই ইচ্ছাই তো ছিল, পারলুম না সে কি আমার দোষ? তবে কেন আমার এ দণ্ড?

—নিজেকে শুদ্ধু হারিয়েছি শুধু তাকেই দেখি কেন? স্বপ্নে নয়, বাস্তব মূর্ত্তি ধরেই আসছে, কিন্তু—কি কুৎসিত, কি জঘন্য, কি সঙ্কটের পথ দিয়েই তার ছায়া আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে! আর কি কোন পথ সে পেলে না? নাঃ, আর সইতে পারচিনে! পালিয়ে এসেছি, আর ফিরবো না। কোন দিন হয়ত কি বলেই বসবো, নিজেকে তো বিশ্বাস নেই! না হলে, আমি—এই আমি—এই ডবল অনার বি এ, ফার্ষ্ট ক্লাশ এম এ—

অ্যাঁ—এই কি সেই আমি? নাঃ, নিশ্চয় না! নিশ্চয় সেই আগের আমি মরে গেছি,—এ তার—কে?—"

নিরঞ্জনের প্রতি লোমকূপ খাড়া হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ অবোধ শিশু যেমন ভূতের ভয়ে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে ছুটিয়া যায়, তেমনি করিয়া নিজের সঙ্গকে সে একান্ত ভয়ে অসহ্য বোধ করিয়া যেন নিজের কাছ হইতে পলাইতে চাহিয়াই ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। ছুটিতে আরম্ভ করিত, যদি না তার কানে দৈববাণীর মত সেই বিজন নদীপুলিনে মানবকণ্ঠের স্বর লহরী ভাসিয়া আসিয়া ঠেকিত! আকুল হইয়া কান খাড়া করিতেই বুঝিল, সামান্য মাত্র দূরে কেহ গান গাহিতেছে। বংশীর আকৃষ্ট সর্পের মতই সে শব্দ লক্ষ্যে অগ্রসর হইল।

গঙ্গায় তখন জোয়ার আসিয়াছে, শব্দ হইতেছিল কল কল কল। জল কিনারায় অনেক দূর অবধি উঠিয়া আসিয়াছে, স্রোতের মুখে দূরগামী পণ্যবাহী কয়েকখানি নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাদের দাঁড়ের শব্দ শোনা গেল ছপাৎছপ্, ছপ্। নিরঞ্জনের ভয়ার্ত্ত বক্ষ চিরিয়া একটা আশ্বাসের আর্ত্তশ্বাস উঠিয়া পড়িল।

গান গাহিতেছিল একটী মেয়ে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও নিরঞ্জন বুঝিল এ শাস্ত্রে মেয়েটীর দখল আছে! সে গানটা এই—

"যে জানে আনন্দময়ী! তোমাকে।
ও সে কি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব দেখে।
যারা দুঃখে হয় ব্যাকুল, ভাবে বিপদের নাই কূল,—
তারা জানে না যে গাছে কেবল ফুটিতেছে ফুল;—
সংসার নিরানন্দের ফুল—
—শেষে আনন্দময় ফল পাকে।"

নিরঞ্জন এক পা এক পা করিতে করিতে কোন্ সময় একেবারে ইহার গায়ের কাছে গিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটী ইহার সঘন নিশ্বাসের শব্দে বারেক চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—তারপর ঘাড় ফিরাইয়া হাত দশেক দূরের একটা গাছতলায় তার বিশ্বাসী দ্বারবানকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে যে গান গাহিতেছিল তাহাই গাহিতে থাকিল। নিরঞ্জনকে প্রথম দৃষ্টিতেই তার পাগল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় নাই। সে গাহিল;—

"বিপদ সম্পদের তরে, দিতে পরম পদ তারে,
ওমা! বিপদ নৈলে জন্মান্ধ জীব ডাকে না তোরে;
মা,-তোর করুণার ফল, বিপদ কেবল, জাগায় অবোধ বালকে।"

নিরঞ্জন চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আচম্‌কা বলিয়া উঠিল, "একি সত্যি, না খালি গান?"

মেয়েটী গান বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সত্যি কথা বাবা?"

কম বয়সী মেয়েটীর মুখে এই গাম্ভীর্য্যময় সম্বোধনটী তাপদগ্ধ নিরঞ্জনের আরও মিষ্ট ঠেকিল। সে মনে মনে পুলকিত হইয়া ছেলে-মানুষের মত প্রগল্‌ভ প্রশ্ন করিল, "ওই যে বল্লেন, 'বিপদ সম্পদের তরে', একি সত্যি?"

নারী কহিল, "হ্যাঁ বাবা! খুব সত্যি।"

নিরঞ্জন কহিল, "আপনি বিপদে পড়ে এর সত্যতা যাচাই করেছেন?"

সে কহিল, "করেচি বই কি! বিপদ সঙ্গে নিয়েই তো জন্মেছিলুম, কিন্তু বিপদ যত ঘন হয়ে এলো, সম্পদও নিকটতর হতে লাগ্‌লো। শেষে যখন সর্ব্বনাশ এসে আমায় গ্রাস করতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনি সময়ে একেবারে তিনি নিজে ছুটে এসে কোলে তুলে নিলেন।—এই যে গাইচি;—

এই বলিয়া সে পুনশ্চ গাহিতে লাগিল—

"পড়ে বিপদের ফাঁদে, ছেড়ে সংসারের সাধে,
যখন কাতর প্রাণে, কুসন্তানে মা' বলে কাঁদে—
তখন, ত্বরায় গিয়ে কোলে নিয়ে, স্তন্য সুধা দাও তাকে।
মাগো! তবে আর এ সংসারে আনন্দ নাই বলে কে'?"

নিরঞ্জন নিস্পন্দ হইয়া গান শুনিল, তারপর বিমোহিতভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমায় মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করচে! মার মতন তুমি আমাকে, যে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলুম, সেই মহাশিক্ষার মধ্যে হাতে ধরে টেনে আনলে, মা!"

মেয়েটী জোড়হাত নিজের কপালে ঠেকাইয়া জবাব দিল, "মা' হবার যোগ্যতা আমার নেই; আপনি আমার বাবা হলেন। নিজের মেয়েকে আদর করে 'মা' বলে, সেই হিসেবে আমায় আপনি 'মা'ই বলবেন। আমার নাম সুরমা। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে এক একদিন এখানের খোলা হাওয়া আর আমার বড় মায়ের অপূর্ব্ব রূপ দেখতে আসি। থাকি কিনা আদি গঙ্গার ছোট্ট মা-টীর বুকে। আপনিও হয়ত আমার মতই উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা কোন উদ্দেশ্য না নিয়েই এসেছেন? আপনাকে আমার কিন্তু বড্ড ভাল লাগছে! হলে কি হয়,

সকাল হয়ে এ'ল, আপনি এখন বাড়ী যাবেন তো? আমিও তাহলে বাড়ী যাই?”

নিরঞ্জন মুগ্ধ হইল, তৃপ্ত হইল। বিস্মিত হইয়া বলিল, “তুমিও খুব বিপন্ন হয়েছিলে বল্লে না? তোমার কথার ভাবে বোধ হলো আজও তোমার সে বিপদের মেঘ কাটেনি। কিন্তু তুমি তো বেশ শান্তভাবেই সইচো?—সংসারকে ‘শ্মশানের’ পরিবর্তে ‘আনন্দ-কানন’ বলেও উল্লেখ করতে বাধছে না! আমি যে তা' ভাবতেও পারিনে।”

সুরমা বলিল, “দেখুন, আনন্দ তো বাইরের জিনিষ নয়, আর কুড়িয়ে বেড়াবারও নয়। নেই, নেই, ভাবতে ভাবতে ও মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে যায়, আর আছে, আছে, জপ করতে করতে মনের মধ্য থেকে সে সহস্রদলে বিকশিত হয়ে ওঠে! সাধুজী এই রকম করেই আমায় ভাবতে শিখিয়েছিলেন।”

ভোর না হইতেই কলিকাতা মহানগরীর নিদ্রাভঙ্গ সাড়ম্বরেই আরম্ভ হইয়াছিল। ট্রাম বাস লোকজন মটর রিক্‌সা ছুটাছুটি করিতেছে। এখানে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁটাইতেছে, ওখানে আবর্জনার স্তূপ লরি বোঝাই হইতেছে, দোকান ঘরের দরজা খোলা হইতেছে, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা আসা যাওয়া করিতেছে। রাতভিখারীরা ঘরের পানে এবং ভোরের কীর্ত্তন গাহিয়া প্রভাত ফেরীর দল বা বৈষ্ণব বাউলেরা চলাচল করিতেছিল। ফলের ঝুড়ি, মাছের বাজরা মাথায় ফোড়েরা বাজারের দিকে চলিয়াছে। নিরঞ্জনকে এত ভোরে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া রাজবাড়ীর দ্বারবানেরা বিস্মিত হইল না। এ বাড়ীর সবাই জানে সে একটা পাগলা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাসি খেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি,
ভেবেছিলাম এম্‌নি করে তোমায় দিব ফাঁকি।
বুকে আমার যে সুর বাজে, গুঞ্জরে যা মর্ম্মমাঝে,
ভেবেছিলাম সুখের সাজে রাখব তারে ঢাকি।

—৺ইন্দিরা দেবী

পড়াশোনা চুকাইয়া দিয়া নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করিতে করিতে একদিন পরিমল হঠাৎ আবিষ্কার করিল নরেশের মুখ বেজায় গম্ভীর হইয়া আছে এবং তিনি ইদানীং তাঁর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত হইয়া গিয়াছেন। পরিমল মনে মনে খতাইয়া বুঝিল, এটা ঠিক বৈরাগ্য নয়, ক্রোধ। পড়া বন্ধ করায় চটিয়াছেন। স্বামীর ক্রুদ্ধ তিরস্কারকে সে অত্যাচার বোধে রাগ অভিমান করিত, কিন্তু তার ভয় ছিল ক্রোধের এই মৌন নির্লিপ্ততাকে। জানিত, ভিতর হইতে না রাগিলে তেমনটা ঘটে না। উদার স্বভাব সমস্ত লোকেদের মত নরেশের মনেও বড় অল্পে আঘাত লাগে। পরিমল ভয় পাইল।

'কর্ণধার' প্রেসের ম্যানেজার গাদাখানেক কাগজপত্র আনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব তর্কাতর্কি করিয়া এই মাত্র চলিয়া গিয়াছেন। নরেশের 'তরুণ' নামক মাসিক পত্র এবং 'নবীন জগৎ' নামীয় সাপ্তাহিক ছিল। সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটিতেছে। ম্যানেজার এমন আভাস দিলেন, নরেশ এতটা নির্ভীক ভাব বজায় রাখিলে চাকরী করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হইবে না। নরেশ এই বিষয়েই ভাবিতেছিলেন।

পরিমল প্রবেশ করিল।

"নিরঞ্জনের কাছ থেকে এই এক্ষুণি পড়ে এলুম।—ওর কাছেই পড়বো, রাগ করো না, লক্ষ্মীটি!"

নরেশ একটা অপ্রিয় আলোচনার পরে অপ্রিয় চিন্তার (এবং শুধু এই একটাই নয়, আরও অনেক গুলারই) হাত হইতে মুক্তি পাওয়ায় হয়ত একটু খুসী হইলেন। বলিলেন, "রাগ করেছি? কই? না, তো!"

পরিমল গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, "রাগ করতে নাকি বাকি রেখেছ!—কদিন ধরে দেখাই পাইনে, কথাই কও না। বলা হচ্চে, 'রাগ করেননি।' কান মলে দেওয়ার চাইতেও এ ঢের বেশী খারাপ, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে না!"

নরেশ নিজের চিন্তা তন্ময়তায় স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যে এতটাই ত্রুটী ঘটিতে দিয়াছেন, বুঝিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ঈষৎ হাসিবার ভাবে কহিলেন, "তাই নাকি?—এসো তবে কানই মলে দিই।" বলিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হীরকখচিত কর্ণমূল দুই আঙ্গুলে নাড়িয়া দিলেন।

পরিমল গলিয়া পড়িল। প্রত্যাশিত চিত্তে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "বল রাগ ভাল হয়েছে, বল? 'রাগ করোনি' বল্লে তো মান্‌বো না। জানি আমার উপর খুব বেশী রাগ করেছ।"

নরেশ প্রত্যাশিনীকে একটু আদর দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আহা, এমন জান্‌লে একটু রাগই করতুম! আচ্ছা, রাগ আমার কি জন্যে হয়েছিল বলো তো? বলবে না? নাই বল্লে, নিজেই মনে কচ্চি, নাঃ পারলুম না,—তুমিই মনে করে দাও। কিন্তু দেখ, যেন মিথ্যে করে যা' তা' বলো না।"

পরিমল এই কথায় অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "উনি রাগ করে জব্দ করবেন আমায়, আবার উল্টে তার হিসেব নিকেশ করতে হবে আমাকেই, বারে! মজা মন্দ নয়!

নরেশ গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া কহিল, "বেশ মশাই! বেশ! এবার থেকে আমার রাগের হিসাব রাখবার জন্যে একটা হিসাব-নবিশই না হয় রেখেই দেবো।"

পরিমল আর এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিল, তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিলে স্মরণ করাইয়া দিল, যেদিন সে নিরঞ্জনের কাছে পড়িবে না বলিয়াছিল, সেই হইতে নরেশের মুখ হাঁড়ি, না তোলো'র মতন হইয়া আছে!

নরেশ তখন যেন চমক ভাঙ্গা হইয়া বলিয়া উঠিলেন; "ওহো তাও তো বটে! তাহলে এখন তাকে নিয়ে কি করি বলো ত? এককাজ করলে হয় না? ওকেই রাগ কর্ব্বার হিসাব-রক্ষী রাখাই তো ভাল! কাজ তো দিতে হবে।"

হাস্যের কলঝঙ্কারে চারিদিক আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিমল বেদম হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ তাই দাও। আমি হরির লুট মেনেচি, তুমি ওকে যাতে নিজের কাজে লাগাও তারই জন্যে। তা হলেই তোমার হিসাবের কড়ি বাঘেও খাবে না।"

নরেশচন্দ্র প্রথমটা তার হাসিতে যোগ দিলেন, তারপর একটু আগ্রহান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "সত্যি কি নিরঞ্জন অত বেশী অন্যমনস্ক?"

"তুমি দিন কতক পরীক্ষা করে দেখ,—আমার মাথা খাও।"

নরেশ কহিলেন, "তাই দেখবো। প্রেসের ম্যানেজার বোধ হয় চল্লো। যে কদিন নতুন না পাই ওকে নিয়ে চালাবো।"

পরিমল পরম পরিতোষ লাভ করিল। সম্বন্ধটা এরূপ না হইলে প্রাতর্বাক্যে ডবল রাজা হওয়ার আশীর্ব্বাদও করিতে পারিত। পরিবর্ত্তে বিশেষ একটু যত্ন সহকারে স্বামীর কপালের ঘাম শান্তিপুরী সাড়ীর আঁচলে মুছিয়া দিল। 'কত ঘামচো?' বলিয়া ঘরে ইলেকট্রিক পাখা চালু থাকা সত্ত্বেও আঁচল ঘুরাইয়া হাওয়া দিতে লাগিল এবং আরও

পতি-সেবার কি কি খুঁটিনাটি সমাধা করিতে মনোনিবেশ করিল, সে খবরে কাজ কি!

কিন্তু দু'দিন না যাইতেই বুঝিল নিরঞ্জনের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়ার মধ্যে অসুবিধা যতই থাক, বুঝি আনন্দও একটু ছিল। আপ্‌নাভোলা নিঃসঙ্গ জীবটীকে সে যে ঘণ্টাখানেকও একটুখানি কাজ দিয়া রাখে; এইটুকু হইতেও সেই কর্ম্মহীন দীর্ঘ অবসরের ক্লান্ত জীবনটাকে বঞ্চিত করা তার কাছে হঠাৎ চৌর্য্যের মতই অপরাধজনক ঠেকিল। এই উপলক্ষে বিপুল রাজপ্রাসাদের দাস-দাসীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত মানুষটীকে সে কতকটা রক্ষা করিয়াও চলিতেছিল। মন তার পীড়া বোধ করিল। আর স্বামীর মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এম্‌নি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, রাত্রে নরেশ শয়ন করিতে গেলে, সে তাঁর পৃথক শয়ন কক্ষে অনাহূত ঢুকিয়া পড়িতে দ্বিধা করিল না। নরেশের মন যদিও পত্নী সম্ভাষণের অনুকূল ছিল না—বড়ই চিন্তা-কাতর; বড়ই ভারাক্রান্ত—তথাপি স্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এসো!"

স্ত্রীর সম্বন্ধে মনের মধ্যে ত্রুটি বোধ থাকায় শরীর মনের নির্লিপ্ততার প্রশ্রয় দেওয়া বুঝি সাজে না।

পরিমল পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিতেই একদিনকার একটা অবিস্মৃত জলন্ত স্মৃতি স্মরণে আসিয়া নরেশের হৃদ্‌পিণ্ড প্রমত্তবেগে দুলিয়া উঠিল। কষ্টে সংযত হইয়া উহাকে বসিবার স্থান করিয়া দিলেন, চেষ্টা সংযতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "এত ভক্তি?"

"অভক্তি ছিল কবে?" বলিয়া পরিমল স্বামীর আশীর্ব্বাদ-দত্ত আদর নিঃশেষে উপভোগ করিয়া লইল। নরেশ হাসিমুখে বলিলেন, "বলবো, কেন প্রণাম পেলুম?"

পরিমল বলিল, "বল দেখি ?"

"আদর খাবার জন্তে।"

"যাও, হ্যাঁঃ,—তা' বই কি! আমি এক্ষুনি চলে যাব।" মুখে অনুযোগ জানাইলেও পাওনা ছাড়িবার লক্ষণ দেখা গেল না।

"তা'হলে নিরঞ্জনের চেলাগিরি ছাড়িয়ে দিয়েছি বলে। এবার ঠিক ধরেছি কি না ?"

"না, তাও না।—ভাল কথা! নিরঞ্জন তোমার কাজ করচে কেমন ?"

"চমৎকার! নিরঞ্জন যে এত বিদ্বান, মনেও করিনি! বি, এ, কিম্বা এম, এ, পাশ না করলে অমন হ'তে পারে না। কে' জানে ওর কি রহস্য!"

নরেশ পরিমলের চেয়ে বোধ করি নিজের মনকেই শুনাইতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, "যতই ওকে দেখ্‌ছি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি! ও যেন একটা জীবনযুক্ত সাঁচির স্তূপ! সারনাথ! বাইরে মাটির ঢিপি, কিন্তু খুঁড়ে তোল, অভিনব ভাস্কর্য্যে বিস্ময় স্তম্ভিত হ'তে হবে। কে' জানে কি করে ওর পরিণাম অমন হলো!"

সহসা বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত কি কথা স্মরণে আসিয়া পরিমল চঞ্চল হইয়া উঠিল, "দেখ, ওর একখানা ডাইরি আছে। আমি দেখেছি ও বসে বসে তা'তে কি সব লেখে। সেইখানা পেলে হয়ত জানা যেতে পারে।"

অবিশ্বাসের মৃদু হাস্যে নরেশচন্দ্রের অধর কুঞ্চিত হইল। "পাগল!—পাগলের আবার ডাইরি! আর থাকলেই বা ও আমাদের দেখাবে কেন? যদি দেখাবেই, তবে বলতে বাধা কি ?"

পরিমল সংক্ষেপে বলিল, "তা বটে।" সেটা কিন্তু তার মনের কথা নয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় বুঝিবে কি তুমি !
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি।
সাধকে কি সিদ্ধি তরে, ইষ্টদেবে পূজা করে,
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় নাক তার ?
চির সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার।
জান না আমায় আমি জানাতে না চাই।
আমি যেন যুগে যুগে এই সুখ পাই।

—৺ইন্দিরা দেবী

নরেশচন্দ্রকে বিমনা ও ব্যথিত করিতেছিল সুরমার এই চিঠিখানা ;—

প্রণাম শতকোটী নিবেদন—

পূজ্যতমেষু !

সেদিন সবকথা আপনাকে বলা হয় নাই। মুখের সাম্‌নে বলার ভরসা না রাখিয়া পত্রে জানাইতেছি, এই সাহস ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার জন্য শ্রীচরণে সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। শিশুপালের শত অপরাধের চেয়ে বেশী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। আর আপনি তো আমার সহস্র অপরাধকেও সহ্য করিতেছেন। তাই ভরসা, আবারও না লইয়া থাকিতে পারিবেন না।.........

সেদিন আপনাকে জানাইয়াছিলাম, আমার বর্ত্তমান জীবনযাত্রা আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে। পাখীকে খাঁচায় পুরিয়া মানুষে তাকে অসম্ভব বিলাসে ভরাইয়া দিয়াও যেমন তার স্বাধীনসত্ত্বাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, মানুষকেও তেমনি দুষ্প্রাপ্য শান্তির ও অজস্র সুখের নীড়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও বুঝি তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রোধ করিতে

পারা যায় না। তার মন যখন কর্ম্মের জন্য উন্মুখ, তখন বিশ্রাম শয্যা তার কণ্টক শয্যা হইয়া উঠে। সে কাঁটা শুধু শরীরকে নয়, মনকেও বিঁধিয়া বিঁধিয়া রুধিরাক্ত করিয়া দেয়। তাই না অধীন জাতির লোকেদের শরীর মন দিনে দিনে দুর্ব্বল হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হয়। নিজেকে লইয়া দিন কাটানো বড় অসহ্য; নিজের দাম এত কমিয়া গিয়াছে—যদি এটা তৈজস পত্র হইত, জঞ্জালের সঙ্গে ঝাঁটাইয়া দিতাম।

কাজ দিন। যে কোনও একটা কাজ। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরী আমি কি পাই না? বেশী না জানি ছোট মেয়েদের তো শিখাইতে পারিব। কোন ভদ্র পরিবারে গান শিখাইবার অধিকার কি আমার নাই? যেখানে আমি আদরের সহিত অভ্যর্থিতা হইব, সেই আমার স্বজাতি-বর্গের মধ্যে পা দিবার কথা ভাবিতে বুক কাঁপে, অথচ আমি জানি সেইখানেই আমার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র। যদি তাদের মধ্যের একটা জীবনও আমার দ্বারা রক্ষিত হয়। জানি আমার মত পুণ্য-সঞ্চয়হীনার পক্ষে সে পুণ্যের প্রলোভন সামান্য নয়। কিন্তু ভরসা হয় না। মনের মধ্যে আমার প্রৌঢ়ত্ব দেখা দিলেও বয়সে আমি আজও কুড়ির সীমা পার হইতে পারি নাই। নিজের উপর বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইলেও পরের উপর এখনও ভয় আছে। তা ছাড়া যাদের আমি পাপ পথ হতে ফিরাইব, তাদের আশ্রয় কোথায়? সবার মনে এত বড় বৈরাগ্য জাগিবে না যে, কাশীবাসিনী হইয়া ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া লইবে।

তা'হলে আমার পথ কি? আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি নিজে একবার সে পথ খুঁজিয়া দেখি। যদি ভদ্র পরিবারের কাজ পাই, অন্যত্র চেষ্টা আমি করিব না। আমার মত অপবিত্রতার পক্ষে স্পর্দ্ধা হইলেও চিরদিন আমার লোভ তাঁদের পবিত্র সঙ্গে নিরালম্ব জীবনটাকে পবিত্র করিয়া নিই। মিশনরী মেমরা তাদের আয়ারা যেটুকু পায়, জানি

না সেটুকু পাওয়ার যোগ্যতা আমার মত হীনজনার আছে কি না?—আদেশ করুন—ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখি? শ্রীচরণে কোটি কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণতি।

আপনার সেবিকাধমা

সুরমা দাসী

নরেশের মনে এই নিরতিশয় বেদনাভরা আবেদনের প্রতি পংক্তিটী বিছায় কামড় মারিতেছিল। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তার প্রতি একবার অভিমান হইল, অমন একটি জীবনকে কেন তিনি এমন ব্যর্থ করিবার জন্য অস্থানে পাঠাইলেন?—নিজের অক্ষমতার পরেও রাগ ধরিল। সে যদি উহার রক্ষাভারই গ্রহণ করিয়াছিল, তবে তার যশ অকলঙ্কিত রাখিতে পারিল না কেন? লোক চক্ষে তার মর্য্যাদাকে এমন নির্দ্দয়ভাবে ক্ষুন্ন হইতে দেওয়া তার নিশ্চয়ই উচিত হয় নাই। পরিশেষে অসহায়া বালিকাকে বন্দীগৃহে একাকিনী দুর্ব্বহ জীবন বহনে বাধ্য করিয়া নিজে উদ্দীপনাময় জীবনে এই যে সরিয়া আছে, এর মধ্যে কত বড় কাপুরুষতা বিদ্যমান! লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া গেল। আরব্ধ কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে যার সাধ্যে কুলাইবে না, সে তেমন কাজের ভার নেয় কেন?

বিস্তর ভাবিয়া সে কয়দিন পরে এই পত্র দ্বারবানের হাতে পাঠাইয়া দিলেন।

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—

সুরমা!

তোমার পত্রে তোমার আগ্রহ ও উদ্যমের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতে এ সম্বন্ধে তোমায় আর নিবৃত্ত করিতে পারি না। তুমি বুদ্ধিমতী—নিজের সম্বন্ধে তোমার বিচার আমার চেয়ে ভালই করিতে

পারিবে। তোমার অন্তরের পবিত্রতা এবং দৃঢ়তা আমার অবিদিত নয়।—যাহা সঙ্গত বুঝিবে করিও। যখন যে সাহায্যের প্রয়োজন, অকুণ্ঠিতচিত্তে জানাইতে দ্বিধা করিও না। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

চিরশুভার্থী

নরেশচন্দ্র

সুরমা এই পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে একবার এবং পরে আর একবার দেব-নির্ম্মাল্যের মত সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় মাথায় ঠেকাইল। পাঠশেষে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া চুপি চুপি চিঠিখানি বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। তারপর গভীর চিন্তায় সে একেবারে মগ্ন হইয়া রহিল। যে অনুমতি পাইবার জন্য কয়দিন দিবারাত্রে বারি-প্রত্যাশী ঊর্দ্ধমুখী চাতকীর ন্যায় আশাপথ চাহিয়াছিল, সে প্রত্যাশা পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কল্পনা—সুন্দর ও মধুর কল্পনা যখন বাস্তবের বেশ ধরিবে, তখন তার সেই মাধুর্য্য যদি মানসীরূপে দেখা না দেয়, যদি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়, তবে সে সহিবে কিরূপে? তারপর সহসা মনে হইল, প্রাণে তার সবই সহিবে। তখন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া সে নরেশচন্দ্রের পত্রোত্তর প্রদান করিল।

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

পূজ্যতমেষু!

আপনার কৃপাপত্র পাইয়া কৃত-কৃতার্থা হইলাম। আপনার আশীর্ব্বাদে চিরদিনের স্বপ্ন সফল করিতে সচেষ্ট হইব। কেমন করিয়া কি করিব, কিছুই জানি না। আপনার অনেক বড় ঘর জানা আছে, কিন্তু সে সব জায়গায় হয়ত আমার প্রবেশ নিষেধ! পরিচয় পত্র দিবার কিছুই নাই, দিলেও কুফলের আশঙ্কাই বেশী। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিতে পারেন কি? যদি সম্ভব ও সঙ্গত হয় করিবেন।

আপনার সেবিকাধমা
সুরমা দাসী

এই পত্র পাইয়া নরেশচন্দ্র আরও বেশী বিব্রত বোধ করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলেন, এ চেষ্টায় সুরমা অকৃতকার্য্য হইবে। তার হতাশার মর্ম্মব্যথা অনুভব করিয়া তিনি উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন। তার যে মুখ অন্ধকারে অর্দ্ধাবরিত, মানসিক সংগ্রামে বিধ্বস্ত অথচ সুদৃঢ় চিত্ত বলে বলীয়ান, সেই যে দু'টী চোখের দৃষ্টি কালের লেখাকেও পরাভব করিয়া মানসনেত্রে ফুটিয়া আছে, নিদ্রা জাগরণে অনুসরণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর একবার তাদেরি মধ্যে তীব্র হতাশার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার শিখা জ্বলিতে তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। সেদিনের ত্যাগে আত্মপ্রসাদ সব ক্ষতিকে জয়যুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু এযে শুধু অপমান! অথচ জীবনের এই লক্ষ্য ধরিয়াই যে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে—শুধু স্বেচ্ছায় নয়—ইহারই জন্য যাহাকে গড়িয়া তোলা হইয়াছে—আর তাই করিতে গিয়াই যে আরও বিশেষ করিয়াই লোক-লোচনের ও জনরসনার তীক্ষ্ণ ও নির্দ্দয় সমালোচনার বিষয়ীভূত দু'জনেই হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, আজ সে পথ হইতে অপরীক্ষিত ভাবেই বা তাকে ফিরিতে বলা যায় কেমন করিয়া?—বিশেষ সকল দিকের পথই যার সঙ্কীর্ণ।—কিন্তু কেমন করিয়াই বা উহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা যায়? যখন মুমূর্ষু সুগন্ধা নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার কথা জানাইয়াছিল, ভবিষ্যতে সুরমা একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গৃহস্থ কন্যাদের সঙ্গীত শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে, এই সাধ জ্ঞাপন করে, তখন সেটাকে নরেশচন্দ্র সঙ্গত ও সহজ বলিয়াই বোধ

করিয়াছিলেন, এবং সেই পথেই উহাকে অগ্রসর হইতে যথেষ্ট সহায়তাও করিয়াছেন। তখন ভুলিয়াও মনে তাঁর এ সংশয় জাগে নাই, তাঁর আশ্রয়ে থাকিলে নিষ্কলঙ্ক স্থরমাকে জনসমাজে কলঙ্কিতা হইতে হইবে এবং তার পক্ষে তখন শিক্ষয়িত্রীর আসন পাওয়া দুর্ঘট! সে ভুল ভাঙ্গিল বহুবিলম্বিত হইয়া।—এখনকার যেটুকু সদুপায় নরেশচন্দ্র তাহাতে আলস্য করিলেন না। স্থরমার পত্রের উত্তর না দিয়া তিনি নিজেই একা বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। সেখানের মহিলা-অধ্যক্ষ পরিচয় পাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে নরেশের মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু দ্বিধার অবসর নাই, তিনি দু'একটা কথা বাদ দিয়া প্রায় সব কথাই খুলিয়া বলিলেন। মহিলাটী বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত পূর্ব্বাপর শুনিয়া গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, "মাপ করবেন মশাই! আমাদের স্কুলে বিশেষ বিশেষ ভদ্রঘরের গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের ভিন্ন কাজ দেওয়া হয় না।"

নরেশ লজ্জানুভব করিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, "মেয়েটী যদি বিনা বেতনে দু'এক দিন গান বাজনা শিখিয়ে যায়, তা'তে আপত্তি আছে?"

প্রবীণা মহিলা অবিচলিতস্বরে জবাব দিলেন, "সেরকম আমাদের নিয়ম নয়! চরিত্র সম্বন্ধে উঁচু রকম সার্টিফিকেট্ অন্ততঃ দু'তিন জন বিজ্ঞ ও বিশেষরূপ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট হ'তে না আন্‌লে স্কুলের মেয়েদের মধ্যে কা'কেও মিশ তে দেওয়া হয়না।"

স্থরমার জীবন চরিতের সঙ্গে এই আপত্তিটার অকাট্য সংযোগ দেখিয়া নরেশচন্দ্র নিরুত্তরে প্রস্থান করিলেন।

আরও দু'এক স্থলে প্রায় একইরূপ উত্তর লইয়া তিনি ও চেষ্টায় বিরত হইলেন। ছোট-খাট অর্দ্ধ-অচল প্রাইমারী স্কুলগুলিতে বিনা বেতনের

সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে হয়ত এতটা তাচ্ছিল্য নাও ঘটিতে পারিত, কিন্তু বড়দের কাছে হতাশ হইয়া নরেশের আর ছোট দরবারে হাত পাতিতে প্রবৃত্তি হইল না। এ'ও মনে হইল, যদি উচিতের দিক ধরিয়া বিচার করা যায়, তা' হইলে এসম্বন্ধে বাধ্য করা বা লোভে ফেলা অনুচিত। সুরমা-জাতীয় জীবেদের বিশ্বাস করিয়া কতকগুলি অপরিণতমতি বালিকার শিক্ষার ভার দেওয়া কতদূর সমীচীন সেও ভগবান জানেন! সুরমা যদি তাঁর এতই পরিচিত না হইত, তবে নিজেই তিনি হয়ত ইহার বিরোধী হইতেন। ভীষণ সমস্যা—এদের পথ দিতে হইবে, কিন্তু সে পথ অন্যের পক্ষে পিচ্ছিল হইয়া না পড়ে, সেদিকেওতো দৃষ্টি রাখা চাই।

নরেশের এক উদারমতাবলম্বী সল্প পরিচিত লোকের সঙ্গে চেনা ছিল। লোকে তাঁকে 'বিশ্ব প্রেমিক' নাম দিয়াছিল। আসল নাম তাঁর বিশ্বপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়। নরেশের মোটর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড় ফিরিতেছিল, বিশ্বপ্রিয় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "রাজাবাহাদুর!"

নরেশ মনে মনে যেন ইহাকেই খুঁজিতেছিলেন। উল্লসিত হইয়া গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলে গাড়ীখানা যতটা অগ্রসর হইয়াছিল তথা হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ততক্ষণে বিশ্বপ্রিয় নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় চলেছেন?" নরেশ গাড়ীর দরজা খুলিয়া ধরিয়া উহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আপনার কাছেই।—আস্‌বেন একটু?"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

না হয় দেবতা আমাতে নাই।—
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা, সাধকেরা পূজা করে ত তাই ?
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে চিরদিন তার বিসর্জ্জন,—
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে, আর কি পূজিবে পৌরজন ?
—কাহিনী

বিশ্বপ্রিয়কে নরেশ সুরমা সম্বন্ধীয় সমস্যার কথা জানাইয়া পরামর্শ চাহিলেন। বিশ্বপ্রিয় সব কথা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিল কিন্তু সুরমার সঙ্গে নরেশের যে কখন কোন অসৎ সম্পর্ক ছিল না, এই কথাটা সেও বিশ্বাস করিল না। রাজা নরেশের এই 'প্রবল প্রতাপান্বিতা' 'উপসর্গ'টীর জন্যই যে তিনি কলিকাতা মহানগরীর আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন—অর্থাৎ বড়লোকের দলে স্থান লাভ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইতেন। এদিকে আবার অন্যদের মত 'নিজ-জনের'—পরিচয় বন্ধুদের সঙ্গে করিয়া না দেওয়া—উহাকে পাশে লইয়া, থিয়েটার সিনেমার রিজার্ভ বক্সে বসিয়া অভিনয় না দেখা, বাগানের মজলিসে 'মুজুরা' না করানোয়, ধনী মহলে যে নিন্দার পরিসীমা ছিল না, এও তো আর লুকানো কথা নয়! আজ হঠাৎ জলজ্যান্ত সেই সম্বন্ধটা উড়াইয়া দিতে চাহিলে বেমালুম উড়িবে কেন? বন্ধুদের মধ্যে নরেশের আড়ালে অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে—(অবশ্য যাঁদের একটু কাব্য-রসোপভোগ সামর্থ্য ছিল)—উল্লেখ করিতে হইলে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে 'বসন্ত সেনার-চারুদত্ত' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বিশ্বপ্রিয় নিজেও কখন কখন যে না করিয়াছে তাও নয়। অতএব সে স্থির করিল, বিবাহিত ও নূতনের আস্বাদপ্রাপ্ত নরেশ সুরমাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ফেলিয়া দিতে ইচ্ছুক। প্রবল অনুকম্পা পরবশ হইয়া সে

তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল, "কুছ পরোয়া নেই! আমি তার জন্য ভাল কাজ ঠিক করে দেবো। গান শেখাবার কাজের আবার ভাবনা! লোকে একটা শেখাবার লোকই পায় না।"

নরেশ বিশ্বপ্রিয়কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিত। নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল। সুরমাকে লিখিল, স্কুলে সুবিধা নয় তবে ভদ্র গৃহস্থ ঘরে কাজের জোগাড় শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা আছে। সংবাদ পাইলেই জানাইবে।

শীঘ্রই সংবাদ পাওয়া গেল এবং অন্তরের সঙ্গে সায় দিতে না পারিলেও এক রকমে মনস্তুষ্টি করিয়া লইয়া নরেশ সুরমাকে সংবাদ পাঠাইলেন। সে চিঠি পাঠাইতে তাঁর কণ্ঠভেদ করিয়া গভীর নিশ্বাস উত্থিত ও পতিত হইল।

কিন্তু সুরমার আনন্দের অবধি রহিল না। কাঙ্গালে যেন নিধি কুড়াইয়া পাইয়াছে—এমন করিয়াই সে সাত বছরের মেয়ের মত আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়াছিল। বিলাতফেরৎ পরিবারে দু' ঘণ্টার জন্য দু' এক রকম বাজনা শিক্ষা দিতে হইবে। বাড়ীতে কেবল স্বামী স্ত্রী। স্ত্রী উত্তর পশ্চিমের নব্য তান্ত্রিক ছেত্রী কন্যা, স্বামী বাঙ্গালী।

সুরমা উঠি পড়ি করিয়া রান্না খাওয়া সারিল। সে নিজেই রাঁধিয়া খায়। নরেশ ইচ্ছা করিয়াই এ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিলাসিনীর গর্ভ প্রসূতা সুরমা বিলাস সুখকে তুচ্ছ বোধ করিতে শেখে, সেই শিক্ষাই তিনি তাকে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সুরমারও ইহাতে বিরক্তি বোধ ছিল না।

আহার সারিয়া তাড়াতাড়ি সে বেশভূষা সমাধা করিল। সুরমা লোকসমাজে বাহির হয়না। ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া জীবনে এই তার প্রথম। কাপড়ের ট্রাঙ্ক খুলিয়া ভাবনা হইল কি পরিয়া যাইবে? যতদিন ছোট ছিল চাঁদনির বাজারে কেনা ছিটের ফ্রক তার জন্য

আসিত। দুর্গা পূজার সময় একটা সিল্কের পোষাকের মুখ সে দেখিতে পাইয়াছে। বার বৎসর বয়স হইলে সাড়ী পরার আবেদন জানায়, তারপর হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর সাধারণ দশহাতি সাদা সাড়ী, টাটা মিলের মার্কিণের সেমিজের সঙ্গে আটপৌরে পরিবার জন্য পাইয়াছে। পূজায় একখানা ঢাকাই বা শান্তিপুর অল্প দামের বেনারসী এই রকমই একটা কিছু পাইত। সেখানি সে দু' একদিন পরিয়া সযত্নে ভাঁজ করিয়া দু' একটী কর্পূরের চাক্তি দিয়া রাখিত। এই শেষ তিন বৎসর নরেশ পূজার কাপড় দেন নাই। খরচের টাকা এই তিন বৎসর তার নামে মনিঅর্ডারেই আসে। রাজবাড়ীর সরকার বা দাওয়ানেরা আর মাসকাবারী বাজার করিয়া দিয়াও যায় না। কাপড় সে পূর্ব্বের মতই কেনে। পূজার সময় নিজের চাকরদের কাপড় কিনিয়া দেয়, নিজের জন্য কেনে না। এই কথা ভাবিয়া মন তার বিমুখ হয়— 'ওরা আমার চাকর, তাই ওদের আমি দিচ্চি, আমি যাঁর দাসী তিনি যখন আমায় দিলেন না, আমার কাজ কি!'

তাই আজ বহুকাল পরে ধূলাপড়া ট্রাঙ্কের ডালা তুলিয়া সে চুপ করিয়া অনেক দিনের পরিত্যক্ত ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারটীর পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। এক একটী সাড়ী জ্যাকেটের ভাঁজে ভাঁজে যেন তার এক একটি অতীত বৎসরের স্মৃতির স্তূপ সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে! সে ঠেলিয়া উহাদের যেন নাড়া দিতেও তার বুকে বাজিতেছিল। তারপর অল্পে অল্পে সরাইয়া সহাইয়া এক একটি করিয়া সে সেগুলিকে মাটিতে নামাইতে লাগিল। এই গোলাপী ডুরে সাড়ীখানি সর্ব্বের প্রথম বৎসর তিনি নিজে হাতে কিনিয়া দিয়াছিলেন! সুরমা কাঙ্গালের মতন সেখানিকে গায়ে বুকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বারম্বার উহা চুম্বন করিল। যেন উহার অঙ্গে অঙ্গে আজিও সেই দাতার হাতের সৌরভটুকু

লাগিয়া রহিয়াছে—এমনি আগ্রহে তার ঘ্রাণ লইল। এ কাপড় পরা চলিবে না—উহা আবার সযত্নে সাবধানে যথাস্থানে রক্ষিত হইল। আর একখানি সাড়ী তার সঙ্গের জ্যাকেটটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই স্থরমার বুকের রক্ত যেন হিম হইয়া আসিল। কালীঘাটের মহিলা সভার সেই জ্যাকেট সাড়ী! গভীর ঘৃণায় ন্যক্কারজনক জঘন্য বস্তুর ন্যায় সে তাল পাকাইয়া সে দুটাকে বাক্সের মধ্যে দু' আঙ্গুল ধরিয়া ঝুপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল। সে দিনের দুষ্ট স্মৃতি তার এই পাপ দেহ যে দিন ভস্মাবশেষ হইবে, সেই ছাইএর মধ্য হইতেও বুঝি মিলাইবে না! নিজের জন্য যত না হোক, সে যে তার আশ্রয়দাতার কত বড় গ্লানির মূল, সে দিন বড় আঘাতেই সেই পরিচয় যে সে পাইয়াছে! তার আগে, স্বপ্নেও যে তেমন সম্ভাবনা তার মনের কোণেও কখন জাগে নাই! জাগিলে—কি করিত?—বলা যায় না। তার দেবতার চিত্তে তার জন্য ব্যথা বোধ যে বিশেষভাবেই আছে, অন্ততঃ এটুকু জানিবার পূর্ব্বে এত বড় লজ্জাকর দুঃসংবাদটা তার কর্ণগোচর হইলে নিঃসন্দেহ সে নিজেকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিত না! কিন্তু এখন? আত্মহত্যার অধোগতি তার এই অধোগতিতে-প্রাপ্ত জীবনের শেষ সঞ্চয় করিয়া লইতে যত না আতঙ্ক হয়, তার চেয়ে বেশী মনে লাগে, তার শোচনীয় মৃত্যু নরেশকে যে কতবড় বেদনাই দিবে—তাই ভাবিয়া।

একখানি ভোমরাপেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী একটি সাদা সিল্কের ব্লাউজ পরিয়া নিজের গলায় পরা একমাত্র সম্পত্তি এক নল সরু গোট হারটুকু জামার উপর তুলিয়া দিতে গিয়া হঠাৎ কি মনে হইল। আরসি পাড়িয়া সে নিজেকে দেখিল। তারপর আবার কি ভাবিয়া সেই জ্যাকেট সাড়ী ও হারটুকু খুলিয়া ফেলিয়া আটপৌরে মোটা সাড়ীর সঙ্গে একটি পাবনা ছিটের রংজলা হাতাবড় জ্যাকেট পরিয়া সাজসজ্জা সমাপ্ত করিল।

হাতে রহিল দুই গাছি করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ও হাতের সঙ্গে আঁটিয়া বসা সোনার চুড়ি। এক সময় উহাদের বরফির মতন কাটুনি ছিল, কিন্তু এখন সে সব নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, দু' এক গাছার মুখও ছুটিয়া গিয়াছে।

নূতন ও সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত জীবনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পাইয়া সুরমার আনন্দের সীমা ছিল না। এত দিনে যেন জন্ম সফল মনে হইল। মায়ের শেষ ও প্রধান ইচ্ছা যে অংশতঃ পূর্ণ করিতে পারিয়াছে, একথা ভাবিয়া মনে সুখ ধরিতেছিল না। মা যে নিজের পথ হইতে সযত্নে তাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আজিকার এই আনন্দময় জীবনের পথ তৈরির সুযোগ দিয়া গিয়াছেন, এই ভাবিয়া সে তাঁর উপর কৃতজ্ঞতা বোধ করিল। নতুবা মায়ের উপরের অভিমান তার প্রচণ্ড! যারা নিজেদের পাপ দিয়া নিরপরাধে অন্য জীবনে কালি মাখাইয়া পৃথিবীর নগ্নবক্ষে কঠিন বন্ধুর ধূলিশয্যায় শোয়াইয়া দেয়, তাদের অপরাধের তুলনা কিছুর সঙ্গেই হয় না! মানুষ নিজেকে লইয়া যা খুসী করুক; কিন্তু আর একটি জীবনকে সে নিজের পথে আনয়ন করিতে কোন মতেই অধিকারী নয়। সেই মার কাছেই বোধ করি জীবনে এই প্রথম সে মাথা নোয়াইল। যখন এই অভিশপ্ত জন্ম তাকে লইতেই হইয়াছিল, তখন ভাগ্যে মায়ের মনে ধর্ম্মজ্ঞানের ঐ বীজটুকু ভগবান রোপণ করিয়াছিলেন, নহিলে আজ তার গতি কি হইত?

চাকরীর প্রথম ধাক্কা খাইল সে চাকরী করিতে মুনিববাড়ী পা দিয়া কর্ত্রী ছাত্রী তাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি মিসেস গুহ;—তা' জানেন বোধ হয়? আপনাকে আমি মিস না মিসেস কি বলবো অনুগ্রহ করে বলে দেবেন। বিশ্বপ্রিয় বাবু সে কথা ওঁনাকে কিছুই তো বলেন নি।"

সুরমার ললাটে অচিন্তিত লজ্জার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সে নতমুখে উত্তর করিল, "আমার নাম সুরমা দাসী।"

"কিন্তু পদবীটা না জানলে আপনাকে আমি কি বলে উল্লেখ করবো,—তারই জন্য সেটা জানার—"

"না না, আমায় আপনি সুরমাই বলবেন। সেই আমার বেশী মিষ্টি লাগবে।"

দ্বিতীয় দিনটা অমনি কাটিল, তৃতীয় দিবসে আর একটা সমস্যা দেখা দিল।

মিসেস গুহ মানুষটী বড় সাদাসিধে ও ভাল মানুষ। মনের মধ্যে তাঁর ছল চাতুরী কম। সে দিন সে আন্তরিকতার সহিতই সুরমাকে জানাইল, তার গান বাজনা শুনিয়া তার স্বামী ও তাঁর একজন বড়লোক মক্কেল বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আগত সপ্তাহে তাঁদের বাড়ীতে একটা বড় রকম 'পার্টি' হইবে, তাঁদের বিশেষ ইচ্ছা সুরমা সেদিন নিমন্ত্রিত সভায় গান ও বাজনা শোনায়।

সুরমা একথা শুনিয়াই অসম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে উত্তর করিল, "মাপ করবেন, আমি পারবো না!"

মিসেস্ গুহ একটু ভুল করিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "কেন পার্ব্বেন না? আপনাকে তো তেমন 'নার্ভাস্' বলে বোধ হয় না!"

সুরমা ম্লান হাসিয়া কহিল, "অপরিচিত পুরুষদের সামনে আমি গাই না, তাই বলছি।"

মিসেস গুহ একটু জিদ করিয়া বলিলেন, "তা'তে দোষ কি? গান গাওয়া কি মন্দ কাজ? ওঁনার ভারি সাধ হয়েছে যে অতিথিদের আপনার এই চমৎকার গান শোনান।"

সুরমাকে রাজী করিতে পারা গেল না।

দিন কয়েক বেশ আনন্দেই কাটিল। সুরমা নিজের মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া বয়স্কা ছাত্রীর শিক্ষাকার্য্য অতি সত্বরে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল। এইটুকু করিতে যে সুখ যে আত্মপ্রসাদ সে নিজের মধ্যে উপভোগ করিতেছিল, বঙ্গ বিহারের শাসনভার হাতে পাইয়াও তাহা লাট সাহেবেরা পাইয়া থাকেন কিনা সন্দেহ! মাস কাবারে যখন চল্লিশ টাকার হিসাবে দশ দিনের মাহিনায় সে ১৩৷৴৫ হাতে পাইল, বুক যেন গৌরবে তার ফুলিয়া উঠিল। নিজের স্বাধীন এবং সৎপথের উপার্জ্জনে সে এখন হইতে নিজেকে পোষণ করিতে পারিবে।—প্রথম মাসের টাকায় মা কালীর কিছু পূজা পাঠাইয়া দিল এবং ভিখারীর জন্য কিছু রাখিল।

হাইকোর্ট বন্ধ ছিল; বাহিরের ঘরে দুই বন্ধুতে বসিয়া বসিয়া চাখিয়া চাখিয়া কোন সুপেয় পদার্থ পান করিতে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ বাজনার শব্দ ভেদ করিয়া সুস্বর সঙ্গীত লহরী কাণের তারে ঝঙ্কার দিল। উৎকর্ণ হইয়াছিলেন দু'জনেই, কিন্তু অল্প পরে সুরেশ্বর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "একি! কে'.গাইচে এ গান? আশ্চর্য্য!"

মিঃ গুহ বলিলেন, "গাইচে আমার স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী সুরমা দাসী! আশ্চর্য্য বল্‌চো কেন?—হ্যাঁ, তা বল্‌তেই পার!—হোয়াট্‌ অ্যান্‌ এক্স-কুইজিট রীচ ভয়েস্‌! কিন্তু—"

বন্ধু এসব কথা কাণে না তুলিয়া এমনই সুরে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, যে, মিঃ গুহর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

"কি হয়েছে? গলা ওর খুব ভাল নয়?"

বন্ধু সহাস্যে উত্তর দিলেন "কে' বল্‌চে ভাল নয়? তা নয়, মাই ফ্রেণ্ড! আমি তোমার জোর কপালের জন্য তোমায় 'কন্‌গ্রাচুলেট'

করচি! 'রথ দেখা এবং কলা বেচা' একসঙ্গে তাহলে দুইই বেশ চালাচ্চো, অ্যাঁ! আছ মন্দ নয়!"

"রেখে দে' তোর হেঁয়ালি! তুই কি চিনিস ওকে?"

সুরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "তা' আর চিনিনে, সুরমা দাসী যে আমার 'নেক্সট্‌ডোর নেবার'। ও গলা শুনেই তাই ধরে ফেলেছি। কি করে বাগালে দাদা?"

"আপনিই এসেছে। আচ্ছা ওর ব্যাপারখানা কি বলতো শুনি?"

"বল্‌চি! রাজা নরেশচন্দ্র বাহাদুরের নাম শুনেছ?"

"উঁহুঁ, কই মনে ত পড়ে না। তার?"

"হুঁ।"

"তা'পরে?"

"চিরন্তনী! খুব দহরম্ মহরম্! বন্ধুবান্ধব নিয়ে গাওনা বাজনা, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মোটর দাঁড় করিয়ে রাখা—তারপর আর কি—'প্রস্থানং কুরু কেশব!' কিছুদিন একলা একলা স্বর সাধনা করে করে ইদানীং বোধ হয় পেটের নাড়ীতেও কিছু টান ধরে থাক্‌বে, তাই শ্রীবৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে এই···ষ্ট্রীটে এসে পৌচেছেন! তোমায় কিন্তু আমার ভারী হিংসে হচ্চে।"

মিঃ গুহ বিস্ময়-সহকারে মন্তব্য করিলেন, "কিন্তু ধরণ ধারণে তো সে রকম মনে হয় না। আমার সাম্‌নেই বার হতে চায় না।"—বলিয়া গান শুনাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া সুরেশ্বর ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আরে রেখে দে' তোর, ঢের দেখেছি! ওসব ওঁদের ছলা-কলা! ওঁরাই 'ছুঁচ হয়ে ঢুকে' 'ফাল হয়ে বার হন'। খুব দাঁও লেগেছে কিন্তু! মস্ত দাঁও! আমি তো এ

পর্য্যন্ত কখন 'তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি'—কিন্তু সেই সঙ্গেই 'মন প্রাণ যা'ছিল তা' দিয়ে ফেলেছি'! গলা বটে একখানা!"

কয়েকদিন পরে সুরমা গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ী ও তার বিশ্বাসী দরওয়ানকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ড্রইং রুমে ঢুকিয়া দেখিল ঘর খালি, মিসেস গুহ সেখানে নাই। অন্যত্র ব্যাপৃত আছেন মনে করিয়া নিজের আসনের কাছে আসিয়া, সে তাঁকে নিজের আগমন জানান্ দেওয়ার ইচ্ছায় যেমন এসরাজ তুলিয়া লইয়াছে, অমনি পাশের ঘরের পর্দ্দা নড়াইয়া মিসেস গুহর পরিবর্ত্তে বাহির হইয়া আসিলেন মিঃ গুহ।

সুরমা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল এ ঘরে তার অবস্থিতি না জানিয়াই গৃহস্বামী অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রস্থান করিবেন, কিন্তু নিরতিশয় বিস্মিতা হইয়া দেখিল, গৃহত্যাগ করার পরিবর্ত্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিয়া তিনি তাহাকেই সম্বোধন করিতেছেন;—

"গুডমর্ণিং ম্যাডাম! আমার গাফিলিতে আপনাকে অনর্থক এই কষ্ট পেতে হোল। মিসেস গুহ আজ বোনের বাড়ী গেছেন, ফিরতে তাঁর রাত হবে, তিনি বলেছিলেন আর্দ্দালীকে বলে রাখতে, আপনি আসা মাত্রে এই খবরটা জানায়, আমার মনে ছিল না, মাপ কর্ব্বেন।" মিঃ গুহ ক্ষমা প্রার্থনা শেষ করিয়া অঙ্গুলি-ধরা চুরোট ঠোঁটে চাপিয়া সেকহ্যাণ্ডের জন্য হাত বাড়াইলেন।

সুরমা তাহা স্পর্শ করিল না। সে রাগে গুম্ হইয়া গেল। কঠিন হইয়া রহিল। তার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "চাকরদের একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বলবেন!"

মিঃ গুহ বড়ই বিপন্নভাবে জবাব দিলেন, "বেয়ারাটা আজ ছুটী নিয়ে

গেছে, আর্দ্দালীটা এই মাত্র খেতে গেল, মালীটাও বাড়ী নেই। আপনি বসুন না, এক্ষুণি ওরা খেয়ে আসবে, ওরা এলেই গাড়ী আপনাকে আনিয়ে দেবো।"

অগত্যাই ভয়বিপন্না সুরমা স্পন্দিতবক্ষে ও শঙ্কিতমুখে দূরের একটা আসনে আলগোছ ভাবে বসিয়া পড়িল। স্পষ্ট করিয়া ইহার অবাধ্যতা করিতেও তার ভরসায় কুলাইল না।

মিঃ গুহ চুরোট টানিতে টানিতে সুরমার আপদ মস্তক খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিতেছিলেন। মনে কিছু বিস্ময় ও দ্বিধা জাগিতেছিল। রাজারাজড়ার অনুগৃহীতার মত রূপ তার শরীরে থাকিলেও বেশভূষায় সম্পূর্ণ বিপরীতই প্রমাণ করে! পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা ও অ-সুখস্পর্শ পোষাকে তার সুডৌল গঠনের সবটুকুই যেন চেষ্টা করিয়া ঢাকা। তার হঠাৎ মনে হইল, বাকল-বসনা শকুন্তলা যেন তার সম্মুখে! আবার মুগ্ধ মন, সুরেশ্বরের ব্যঙ্গোক্তি স্মরণ করিল;— 'ওসব ওদের ছলা-কলা, ঠাট, ঠমক!—'

মিঃ গুহ তখন দ্বিধাশূন্যভাবে আলাপ সুরু করিলেন, "একটা গান্ না, চমৎকার গলা আর হাত আপনার!" এই বলিয়া তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার সত্য সত্যই সুগঠিত ও সুললিত হাত দু'টির পানে চাহিয়া রহিলেন। সেই দৃষ্টি চোখে না দেখিয়াও অনুভব করা যায়! সুরমার ললাট হইতে বক্ষ অবধি সেই অনুভূত-মুগ্ধ-দৃষ্টির লজ্জায় রং মাখান হইয়া গেল। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়া উহাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়া ফেলা হইবে বোধে সে অত্যন্ত বিনীত ও মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ থাক, একটা গাড়ী যদি আমায় দয়া করে আনিয়ে দেন।"—

মিঃ গুহ যথাপূর্ব্ব বসিয়া থাকিয়া উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ব্যস্ত হচ্চেন কেন;—বলেছিতো চাকররা বাড়ী নেই, এলেই গাড়ী পাবেন।

ততক্ষণ না হয় এসরাজটা একটু বাজান না। আমরা কি শোনবার যোগ্যই নই ?"

এরূপভাবে একজন অপরিচিত পুরুষকে তার সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়া সে যত বিস্মিত ততই আহত হইল। আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফিরাইয়া বারেক ইহার দিকে চাহিয়াই সে পরুষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা করবেন; কিছুই আমি আজ পারবো না।"

মিঃ গুহ তখন আর এক পথ ধরিলেন।

"সুরেশ্বরকে আপনি জানেন? সুরেশ্বর বোস? আপনার পাশের বাড়ীতেই থাকে।"

সুরমার রাঙ্গামুখ সাদা হইয়া গেল। বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল; অস্পষ্টস্বরে সে বলিল, "না—"

"সে কিন্তু আপনার অনেক কথাই বল্লে। আপনার গান শুনেই চিন্‌তে পেরেছিল। আদি গঙ্গার উপর···রোডে 'সুরম্য-কুটিরে'র ঠিক পাশেই হল্‌দে রংয়ের বাঁহাতি বাড়ীখানা তার।···"

সুরমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় ধড়ফড় করিতে লাগিল। উঠিয়া পলাইয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছায় তার পা তাহাকে টানিতে লাগিল। এই অপরিচিত পুরুষের চোখে তার মর্য্যাদা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে কথা সে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল এবং এ'ও বুঝিল যে তার অমন পরিচয় না পাইলে কখনই তিনি তাহার সহিত এই ভাবের সম্ভাষণ করিতে সাহসী হইতেন না। তার বুক ঠেলিয়া কান্না আসিল।

"দেখুন, সংসারে এই রকমই ঘটে! সব মানুষ যদি সমান ভদ্র হতো, তা'হলে পৃথিবীতো স্বর্গ! তা'বলে আপনার এ বয়সে এই রকম খেটে খাবার দরকারও তো কিছু দেখতে পাইনে'! সব্বাই অবশ্য রাজা নরেশচন্দ্র না হতে পারে, কিন্তু আমাদেরও যে মনে কোন সখসাধ নেই,

তাও তো নয়। যাতে তোমার কোন দিকে কোন কষ্ট না হয়, হাতে দু'টো পয়সা জমে, দু'খানা গহনা গাঁটি গায়ে পর্‌তে পারো, তার জন্য আমাদের বিশেষ রূপেই চেষ্টা থাক্‌বে। আর এই একজোড়া মুক্তোর দুল তোমার জন্যে এনেছি—"

চেয়ার ঠেলার শব্দে মিঃ গুহকে উত্থিত বোধ করিয়া তাড়িৎ স্পৃষ্টের ন্যায় লাফ দিয়া উঠিয়া দিক্‌ বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্যের মতই সুরমা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া—কিছুমাত্র হিসাব না রাখিয়াই সে বাড়ী ছাড়াইয়া বাগানের মধ্যে পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিল। ইতিমধ্যে পিছনে একবারও চাহিয়া দেখিল না। তারপর সদর রাস্তায় আসিয়া যখন পড়িতে পড়িতে গ্যাস পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তখন কাহাকেও অনুসরণ করিতে না দেখিয়া তার দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তখন মনে হইল, অত জোরে না ছুটিলেও হয়ত বা চলিত। বাস্তবিক তো কেহ তাহাকে ধরিতে আসে নাই! অপর কেহ দেখিতে পাইয়া থাকিলে কি না জানি মনে করিয়াছে? তারপর কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া, শুষ্ক অধর ও কণ্ঠ কোনমতে একটুখানি রসসিক্ত করিয়া লইল এবং পথের খবর না জানিয়াই সে দ্রুতপদে যেদিকে চোখ যায় চলিতে আরম্ভ করিল। তখনও তার মনের মধ্যে ভয় ও সন্দেহ তুমুল হইয়া রহিয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তোমার হাতে দিলাম প্রিয়, মরমব্যথার ছিন্ন খাতা,
নাইবা র'লো হীরক চুণী, অশ্রুজলের মুক্তা গাঁথা।
ছিন্নকুসুম হলোই বা এ, হলোই বা এ ব্যথার বোঝা,
আঁখির জলে করছি তবু, তোমার প্রেমে তোমার পূজা।

—স্মৃতির পরশমণি (ইন্দুরাণী দেবী)

মানুষের হৃদয়রহস্য যে দেবতাদেরও অপরিজ্ঞাত—এ কথা অস্বীকার করা চলে না; এবং বোধ করি অস্বীকারও কেহ করে না। কিসে যে তার সুখ, আর কত অল্পেই যে সে দুঃখ পায়, বুঝিয়া ওঠা ভার! নিরঞ্জন যতদিন পরিমলের শিক্ষকতা করিতেছিল, অস্বস্তির অন্ত ছিল না। এমন কি, একদিন সে অশান্তি তার সীমা ছাড়া হইয়া যাওয়ায় অমন যে স্নেহ-নীড় এই বাড়ী, তাও ছাড়িয়া তাহাকে পলাইতে উদ্যত করিয়াছিল। আবার যখন আপনা হইতে সেই দুরূহ কাজটা তার ঘাড় হইতে নামিয়া পড়িল, অমনি বুঝিতে পারা গেল যে, যেটাকে সে অসহ্য পীড়ন বোধ করিতেছিল, ঠিক সেইটিতেই যেন তার সব চেয়ে বড় সুখের উপাদান অলক্ষ্যভাবেই নিহিত হইতেছিল। বিগতপ্রাণ প্রিয়তমের মূর্ত্তি মানুষ প্রাণপণে স্মরণে আনিয়া তার ধ্যানস্থ হয় অথচ প্রাণও তাহাতে কাঁদিতে থাকে। ওই সম্মানিতা ছাত্রীটীর সর্ব্বাবয়বে কোন্ এক হারানিধির পূর্ণ সাদৃশ্য অনুভব করিতে থাকিয়া তাহাকে সহ্য করা যেমন নিরঞ্জনের পক্ষে কঠিন আবার তেমনই বুঝি তারই মধ্যে একটা দুরন্ত সান্ত্বনার অসীম শান্তি তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে একান্ত ভাবে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। পূর্ব্বে সেটা সে বুঝে নাই, এখনি বুঝিল। যখনি পরিমল যে তার কাছে আর পড়িতে আসে না, একদিকে ইহাতে নিশ্চিন্ত

হইলেও আর একটা দিকে খুশী ঠিক হইতে পারিল না। আবার নিজের মনের এই অমার্জ্জনীয় ত্রুটী লক্ষ্যে আসিতেই অত্যন্ত অপ্রসন্নচিত্তে মনকে কঠিন পীড়ন করিয়া আত্মগত বলিল, "খবরদার! পাগলামী করো না। তোমার স্বপ্ন তোমার অন্তরেই চাপা থাক—বাইরে তার ছবি যেন কোন মতেই না ফুটে ওঠে!

প্রেসের অল্প স্বল্প কাজ হাতে লইয়া সে ক্রমে তার প্রায় সব টুকুই নিজের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিল এবং ইহাতেই আশ্রয় করিয়া তার এতদিনের যে শক্তি যে অধ্যবসায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই আবার পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল। একবাক্যে সবাই স্বীকার করিল যে, এমন উদ্দীপনা, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মক্ষমতা আর তীক্ষ্ণধী কর্মচারী এসব কাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। যারা এতদিন তাকে অপ্রকাশ্যে উপহাস ও প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিতেছিল, তা'রা লজ্জা পাইল।

বস্তুতঃ মানুষের শক্তির আধার কখন যে খালি হইয়া যায়, আবার কেমন করিয়া ভরিয়া উঠে, তার কোন হিসাব নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে কত উৎকৃষ্ট বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, অথবা বপন করাই ঘটিয়া উঠে না। নিরঞ্জন একটু একটু করিয়া যেন তার হারানো শক্তি এই আশ্রয়ে আসিয়া অবধি খুঁজিয়া পাইতেছিল। পরিমলের সঙ্গে মাস-খানেকের মেলামেশায় তার মরিচাধরা বুদ্ধির কৃপাণে কিছু কিছু শানও পড়িয়াছে। এবার কাজের মধ্যে ডুবিতে পাইয়া তার উপরের সমস্ত ধূলী জঞ্জাল যেন ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া গেল। এখন সে আর তেমন গভীর অন্যমনস্ক হয় না। মাসমাহিনার টাকাগুলা দিতে আসিলে খাজাঞ্চীকেই জমা রাখিতে বলিয়া গোটাকতক লইয়া চাকর মহলে বাঁটিয়া দেয়। সাতু খানসামার দল মুখ বাঁকাইয়া গ্রহণ করে ও নিজেদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা করিয়া বলে, "বাছা হন্থ আমাদের এবার

চতুর হয়ে উঠচেন বটেক!" আর একজন বলেন, "হবে না বা কেনে? এখন যে প্যাটকে রাজ্জা-সায়েবের সরু চেলের ভাঁত পড়চে বটে! ও-ভাঁতকে হজম করে চলা চাট্টি কথা নয়! ওর জোরে অনেক 'পোঁটাচুন্নির বেটা বেটী চন্নন বিলাস' হয়ে উঠ্‌লো বটেক!—"

যে খাতাখানার কথা সেদিন পরিমল স্বামীর কাছে বলিতেছিল, সেখানায় মধ্যে মধ্যে নিরঞ্জন নিবিষ্ট হইয়া কি সব লিখিত্‌। সেটার আরম্ভ ছিল এই রকম;—

"এই মলাট-ছেঁড়া চার পয়সা দামের খাতাখানা হাতে পেয়ে আজ হঠাৎ ডায়রি লেখার কথা মনে পড়ে গেল। মনে যে পড়লো সেটা কিছু বিচিত্র নয়! কতকালেরই যে ওটা আমার অভ্যাস ছিল।—কিন্তু নয়ই বা কেন? আমার এ জীবনটার সকলই যে বৈচিত্র্যময়! এর মধ্যে পূর্ব্ব সংস্কারগুলো এখনও যে কেমন করে না মরে বেঁচে আছে এবং সুযোগ পেতেই মাথা তুলে খাড়া হচ্চে, এইটেই তো বিচিত্র! নিজেই আমি অবাক হয়ে ভাবচি, তাহ'লে আমার দ্বারা এখনও আবার এ পৃথিবীর কোন কোন কাজ চালিয়ে নিলে নেওয়া চলে? আশ্চর্য্য!—ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে কিন্তু!—

"আচ্ছা, আমি আগে কি ছিলুম—সেটা মনে কর্ব্বার চেষ্টা করা মন্দ নয়! যা' ছিলুম আর এখন যা' হয়ে দাঁড়িয়েছি, এ থেকে আমিই আমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে, তা' আর পাঁচজনে কি করে পারবে? কিন্তু নাই বা পারলে? সে পারবার কিছু দরকারও ত নেই! সে লজ্জা আমি আমাকে কোন মতেই দিতে পারবো না।—না, না, আমার অতীত!—আমার সোনার স্বপন! আশায় আনন্দে উৎসাহে সম্মানে ভালবাসায় ভরা আমার বাল্য-কৈশোর-যৌবনের অতীত! যত মাধুর্য্য যত আকর্ষণই তোমার মধ্যে থাকে থাক, তুমি শুধু আমার

খ্যান আমার ধারণার মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে থাক—পথের ভিখারী নিরঞ্জনের কাছে তুমি ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত রাজপ্রাসাদের মত গোপন আকাঙ্ক্ষার ধন হয়েই থাক। এই কর্কশ বন্ধুর অশুভ বর্ত্তমানের মধ্যে টেনে এনে তোমায় আমি আঘাত করবো না—লজ্জা দেব না।

"নিজের কথা ভাব্‌তে গেলেই মনে হয় এর আগে যে জন্মটা আমার চলছিল, সেটা যেন শেষ হয়ে গিয়ে আর একটা যে নূতন জন্ম আরম্ভ হয়েছিল তাই চল্‌ছে। বস্তুতঃ ও তো তাই! আমার সে জন্মে আমার চেহারাখানা ঠিক কার্ত্তিকের মত নাই থাক্, ঘরে পরে সবাই যে আমার রূপের তারিফ করেছে, সে তো নিজের কানে বার বার শোনা। আর এখন? আমায় দেখলে লোকে আঁতকে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ছোট ছোট ছেলেরা কখন কখন ভয়ে কেঁদে ফেলে—পালিয়েও যায়, সেও তো আমি জানি!—জন্ম আমার ঠিকই বদলে গেছে, তবে এবারে জাতিস্মর হয়ে জন্মেছি বলেই না এত জ্বালা! পুরানো কথা মধ্যে যেমন কিছুদিন ভুলে গিয়েছিলেম, তেমনি বরাবরের জন্য একেবারে যদি ভুলেই যেতেম, সে যেন ঢের ভাল হতো!—তবে দুঃখ এই যে, জন্ম নতুন পেলেও এবারে আর কচি ছেলে হয়ে জন্মে মার বুকে ঠাঁই পেলেম না! আর একটু একটু করে বাড়্‌তে গিয়ে ছেলেরা যে সোনার দিনগুলি পায়, তা'ও আমার ভাগ্যে জুটলো না—একবারে এই বাজপড়া তাল গাছের মতন আমাকে নিয়ে আমার এই নবীন জন্ম আরম্ভ হলো!

"আচ্ছা, বাড়ী ছিল আমাদের সদর চট্টগ্রামের যে দিকটায়, সে সবই তো দেখছি ঠিক ঠিক মনে পড়ে যাচ্চে! মধ্যে কিন্তু এসব কথা এমন করে স্পষ্ট মনে করতে পারতাম না। আমার ঠাকুরদা মশাই শুনেছি নেহাৎ নির্ব্বিরোধী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর এক বিশ্বাসী (!) আমলার কারসাজীতে পড়ে তাঁর তালুকখানি তিনি খুইয়ে ফেলে, মনের দুঃখে,

এইখানে এসে বাস করতে থাকেন। একথা মার কাছেই শুনেছি। তার আগে তিনি গাজন হাটের পাঁচ আনির মালিক ছিলেন। অনাবাদী জঙ্গলে আয় বেশী ছিল না বটে, তবে ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল ছিল কি শোনা যায়। কিসের একটা খনিও নাকি পরে পাওয়া গেছলো।

আমার বাবাকে আমার বেশ মনে আছে। ফরসা রং, দেড়হারা পাতলা চেহারা, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কি অদ্ভুত উদার মনই তাঁর ছিল! আমার বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। একবার সূর্য্যাস্ত খাজনার দায়ে ঐ গাজন হাটেরই তালুক—তখন আর তা' পাঁচ আনি নেই—তার ষোল আনাই তখন কর্ম্মকর্ম্মা ও কর্ম্মচারী গিরিশচন্দ্র মিত্রের হয়ে গেছে,—সেই তালুক লাটে উঠেছিল। বাবা খুব সামান্য দামে তাঁর নিজের সেই পৈতৃক বিষয় একজন চাকরকে দিয়ে কিনিয়ে রাখেন এবং পরের দিন নিজের হাতে পত্র লিখে যারা তখন তাঁর ন্যায্য বিষয় অন্যায্য ভাবে ভোগ করছিল, তাদেরই খবর দেন যে কেনবার টাকাটা পেলেই তিনি ওদের তালুক ওদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। হলোও তাই! আমার আজও সেই কথা মনে করতে আহ্লাদে আর গৌরবে বুক নেচে উঠছে। আমি সংসারে এসে কা'র জন্যে কি করলুম?

পিতৃহীন হয়েছিলেম অসময়ে। সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কল্‌কাতায় পড়তে গেছি, বিনামেঘে বজ্রাঘাত হলো। ভাই বোন আমার আর কেউ ছিল না, মার পক্ষে বড্ডই কষ্টকর। ছুটীর সময়টুকুই তাঁর কাছে থাকি, বারমাস তিনি একলা। তিনি খুব উচ্চ-মনা বিদুষী মহিলা ছিলেন।

কল্‌কাতার হোষ্টেলে যাঁরা বাস করেছেন, আমাদের মতন পাড়াগেঁয়ে বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চলের ছেলে গেলে

তাদের সেখানে কি অবস্থাই ঘটে, সে হয়ত তাঁদের জানা আছে। কোন্ সময় অন্যমনস্ক হয়ে একজন 'কে'ডারে ডাহে?'—বলে ফেলেছে, —আর রক্ষা নাই! খোঁজ করে করে তাই নিজের স্বজাতি (?) দেখেই ভাব করে ফেলা যেত এবং এক ঘরের পড়সী হলেও পশ্চিমবঙ্গকে 'দূরে পরিহার' চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকতেম। আমাদের পক্ষে তাঁরা ছিলেন একটু 'দুর্জ্জন'।

কালীপদ আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। জীবনে সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ প্রথম স্থাপন করতে যাওয়া—আর কি ঘনিষ্ট যোগই যে হয়েছিল! এত ভালবাসা বোধ হয় আর কারুকেই কখন বাসতে পারিনি—আর, না—বাসতে পারবোও না। এখন কি আর সে রকম প্রাণঢেলে ভালবাসার শক্তিই আছে? মন ছিল তখন একটা কাদার তালের মতন, তাকে রকম বেরকম করে ছাঁচে ঢেলে নিলেই হলো। এখন হয়েছে সে একখানা নিরেট পাথর। তাকে ভাঙ্গাও যায় না, গড়াও যায় না।

কালীপদ আমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিল বটে; তবু আমার মতন নয়! সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় কথাটাই আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, আমি হলে কিন্তু তা' পারতুম না। যাকে ভালবাসলেম, তার সঙ্গে যদি অত বড় আড়ালই রেখে দিলেম, তা'হলে আর প্রাণে প্রাণে যোগ হবে কি করে? গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগে যদি একটা প্রকাণ্ড পাহাড় ঠেলে ওঠে, তাহলে যুক্তবেণীর সব মহিমাই যে তুচ্ছ হয়ে যাবে! কালীপদর যে আমায় না জানানো অত বড় গোপন কথা ছিল, সে আমি জানতে পারলেম একেবারেই অসময়ে।—যেদিন পুলিসের লোকে আরও কজন ছেলের সঙ্গে তারও ঘর তোলপাড় করে' একটা ছোট্ট রকম বোমার সরঞ্জামের সঙ্গে তাকেও ধরে হাতে হাতকড়ি দিয়ে ও কোমরে দড়ি

বেঁধে নিয়ে চলে গেল সেই ঘোরতর দুর্দ্দিনে। আমাকেও দুদিন একটু টানাটানি করেছিল; কিন্তু নিতান্ত আনাড়ী বুঝে শেষটা দয়া করে ছেড়েই দিলে।

'পদ'র সঙ্গে শেষ দেখা তার আন্দামানে যাবার আগের দিন। দেখা হতেই খুব হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলে। হাত তার বাঁধা। দণ্ডিত অপরাধী পাছে কিছু করে বসে—তার কিন্তু সে মতলবই নয়! খুব প্রফুল্ল হয়ে সোৎসাহে অনেক কথাই সে অনর্গল বলে গেল। তারপর সবের শেষের অনুরোধ আমায় সে এ জন্মের মতই জানিয়ে দিলে।

'রমেশ! তোমার তো আজও বিয়ে হয়নি, তুমি সুখদাকে বিয়ে করতে পারবে না? তাহলে এ জন্মটার মতন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘানি ঘোরাই এবং যাতে শীঘ্রই আর একটা নূতন জন্ম পাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেখি।'

আমি বিস্মিত হয়ে বল্লাম, 'সুখদা কে?'

'কেন, তোমায় তো আমার বোনের কথা আমি বলেছিলুম! সুখদা তারই নাম। ধরো এই আমার মতনই অনেকটা তাকে দেখতে— পারবে না?'

"আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর করলেম, 'তোমার বোন এই যথেষ্ট! কেন পারবো না। ঈশ্বর সাক্ষী তোমার বোনের জন্য তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থেকো।"

'পদ' খুসী হয়ে আমায় তার বাঁধা হাত দিয়ে জীবনের শেষ আলিঙ্গন চুকিয়ে দিলে।—সেই আমাদের শেষ দেখা! জীবনের প্রথম প্রভাতে যা' পেয়েছিলেম, জীবনের প্রথম প্রভাতেই তাকে হারিয়ে ফেল্লেম! বিশ্বাসের গণ্ডী দিয়ে বেঁধে সে যাকে আমার সঁপে দিয়ে গেল, তাকেও

আমি নিজের পাপে নষ্ট করে ফেলেছি—সে ত হারিয়ে গেছে! কিন্তু দু'জনকারই স্মৃতি আজও আমার বুকে আগুন হয়ে ঠিক্‌রে পড়চে, উল্কা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ভুলতে আজও তাদের একজনকেও তো পারিনি।—আর কি কোন দিন পারবো?

"—কে' আস্‌চে? তিনিই কি?—কেন তাঁকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে? সুখদা যদি রাণী হতো, তা'হলে তাকেও হয়ত ঐ রকমই সুন্দর দেখাতো! মানুষে মানুষে মিল থাকে দেখেছি, কিন্তু এতটা মিল এর আগে কখন কারু মধ্যেই আমি দেখিনি!"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে ওগো পরাণ প্রিয় ?
এত নহে তৃণদল ভেসে আসা ফুল ফল,
ব্যথা ভরা মন—এ যে ব্যথা ভরা মন—মনে রাখিও !
—রবীন্দ্রনাথ

প্রবল মানসিক উদ্বেগে ও অপরিজ্ঞাত উত্তেজনায় সুরমার সে রাত্রে জ্বর আসিল। দিন দুই সে সেই জ্বরের কষ্টে ও মনের কষ্টে বিছানায় পড়িয়া রহিল।

নিজের উপরে তার ঘৃণা ধরিয়া গিয়াছে। এমন কালামুখ তার যে, সে কোথাও বাহির করিবার উপায় নাই! থাক্ তবে সুড়ঙ্গের মধ্যে বিষেভরা সাপের মত এ জন্মটা তার লোকচক্ষের অন্তরালে, তাদের নির্ম্মম সমালোচনার মধ্যেই কাটিয়া যাক! মনে পড়িল—নরেশ সেদিন তাকে বলিয়াছিলেন; "স্বাধীনতার মধ্যে কি দুঃখ নাই? লজ্জা নাই?" সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গলদশ্রু-নেত্রে দু'হাত জোড় করিয়া আত্মগতই কহিতে লাগিল, "দেবতা আমার! দেবতা আমার! তোমার দিব্যদৃষ্টি যে সে দিন এত সূক্ষ্মভাবে আমার এই অপমানগুলো দেখতে পেয়েছিল, তা' তো আমি জানিনি!—কেন তবে আমার অজ্ঞতার আব্দার গ্রাহ্য করলে?"—তারপর সবিস্ময়ে সে ভাবিল, যে পৃথিবীতে নরেশচন্দ্র আছেন, মিঃ গুহর মত লোকেও সেখানে কেমন করিয়া বাস করে?

ডাকের পিয়ন একখানি পত্র দিয়া গেল। সুরমার নামে কালে ভদ্রে একখানা পত্র আসিলে সেখানা নরেশচন্দ্রের নিকট হইতেই আসে! আজও সেই বিশ্বাসেই পরিপূর্ণচিত্তে সাগ্রহে পত্রখানা লইয়া মাথায়

ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ লক্ষ্য করিল, হস্তাক্ষর নরেশচন্দ্রের নহে এবং খামখানা অন্য ছাঁদের। চিঠি লিখিবার লোকের বালাই তার কোথাও নাই, কে' লিখিল তাকে এই চিঠি? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই এসেন্স সুবাসিত মোটা খামখানা সে মাথার কাঁটা দিয়া খুলিয়া ফেলিল। সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের লেখা, আর—সম্পূর্ণরূপেই অবমাননাজনক ইহার বর্ণবিন্যাস! ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া চারি পৃষ্ঠা চিঠির শেষে নামের স্বাক্ষরটা উল্টাইয়া দেখিতে গেল। সেখানে লেখা আছে—"তোমার একান্ত দর্শনাভিলাষী সুরেশ্বর বসু।" চিঠির উপরে এ বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর নম্বর দেওয়া রহিয়াছে, অথচ পত্র আসিল ডাকের ছাপ লইয়া! তখন মিঃ গুহর কথা মনে পড়িল, তার প্রতিবেশী সুরেশ্বর বোসকে সে চেনে কিনা, এই প্রশ্ন তিনি সেদিন করিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর মিঃ গুহর বন্ধু। প্রচণ্ড ক্রোধে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া গেল। অতি সামান্য পঠিত পত্রখানা সে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আবার কি ভাবিয়া তাহা গদির তলায় তদবস্থাতেই রাখিয়া দিল। সে পত্রে যে সব কথা লেখা হইয়াছে তার আভাস দু'চার পংক্তির মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে এবং সেদিন মিঃ গুহের মুখে সে কথা শুনিতেও তার বাকি নাই। রাজা নরেশচন্দ্র তাহাকে যে ভাবে রাখিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে এক্ষণে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাহারা উহাকে রাখিতে প্রস্তুত, ইত্যাদি অনেক কথাই সেই পত্রে লেখা আছে। পত্রখানা নরেশকে দেখান উচিত বোধেই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল না।

কানাই সিং বিস্তর রাগারাগি করিয়াও তাহাকে রাঁধাইতে না পারিয়া বিষম ক্রোধে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল, "তা'হলে হামিও আজ আর রুটি বানাবে না। এমন করে রোজ রোজ উপোস

দিলে যে তোর জ্ঞান বার হয়ে যাবে রে, খুকি-বউয়া! থোড়া কুচ তো আদমী মুহেমে দেয়।"

তারপর নিজের তৈরি আটার রুটি ও আলুর তরকারি বানাইয়া এক ঘটি জল ও থালায় খাবার আনিয়া তার সামনে ধরিয়া দিয়া বলিল, "লে' উঠ! বৈঠকে দোঠো খা'লে বাবা! দোঠো খা'লে!"

সুরমার চোখ দিয়া এতক্ষণের পর চোক নাক জ্বালা করিয়া অকথ্য যন্ত্রণারাশি তপ্ত অশ্রুর আকারে ছুটিয়া বাহির হইল। নিজের যে অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথা তার মনের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিয়া তাহাকে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিতেছিল, এই একমাত্র স্নেহ করিবার বহু দিনের বৃদ্ধ সাথীটির এইটুকু স্নেহাভিব্যক্তিতে সেই অব্যক্ত দুঃখ তার ব্যক্তের সীমায় ফিরিয়া আসিল। সে খাবার কোলে করিয়া ক্রমাগত চোক মুছিতে লাগিল।

কানাই সিং সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "খেয়ে লে' বউয়া হামার! খেয়ে লে। তোর অসুখ কুচ্ছু বাড়বে না, আমার কথায় বিশোয়াস্ কর। কচি বাচ্চা তুই কেত্তা উপোসী থাকবি রে?"

অনেক কষ্টে গলাধঃকরণ করিয়া সুরমা তার পুরাতন বন্ধুর যত্নের দান মোটা রুটির দু'এক খানা খাইয়া বুঝিতে পারিল, এটুকু পাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া সে তখন স্নেহকারীকে একটু খুসী করিবার জন্য তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিল, "সিং-জী! আচ্ছা তোমার বউমেয়েরা সেখানে গেলে তোমার রুটি গড়ে দেয় তো? সেখানে তো নিজে রাঁধতে হয় না?"

কানাই সিং একগাল হাসিয়া জবাব দিল, "আরে নারে বউয়া! সেখানে হামি কিসের দুখ্‌কে নিজে রাঁধবো বল্? কিসমতিয়া, বহুয়া হামার বড়া পুতো, নান্‌কিয়া মাই—সবকোই রুটি পেকিয়ে দেয়,

হামি বৈঠে বৈঠে খাই। সেখানে রুটি বড়া মিট্ লাগে। পানীমে মিঠা বহুত! আহা কব্ না কব্ ফিন্ যেতি পারবে, সে তো না জানে কুছ!"

অকস্মাৎ কি যেন একটা ক্ষীণ আলোর-রেখা এই বিরহী-বৃদ্ধের মৃদু পরিতাপের মধ্যে দিয়া সুরমার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল। কাঙ্গালের মত দু'চোকভরা আগ্রহ লইয়া কানাই সিংয়ের মুখের পানে সে ব্যাকুলনেত্রে তাকাইল।

"সিং-জি! আমায় তুমি ফেলে যেও না! তুমি আমায় সঙ্গে করে তোমার দেশে নিয়ে চলো। তাই নিয়ে চল, সিং-জি!—যাবে নিয়ে?"

কানাই এই ব্যগ্র আবেদনে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও এ প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। আপ্রান্ত মুখ দন্ত বিকশিত করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "হামার বাড়ী গিয়ে কি তুই থাকতে পারবি খোঁকি-ববুয়া! সে মাটির বাড়ী, তায় খাপ্‌রার চাল। কি করবো হামি গরীব আদ্‌মী আছে! রাজাবাবু তোকে যেতি দিবে না?"

সুরমা উত্তেজিত আবেগে অধীর হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "খুব দেবেন—খুব দেবেন! আমি কোথাও সরে যেতে পেলে তিনিও—যে রা—না না, কেন দেবেন না? কিন্তু আমি সেখানে গেলে তারা কি আমায় ঘরে ঢুক্‌তে দেবে, সিং-জী? আমি গিয়ে কোথায় থাকবো?" সুরমার অর্দ্ধেকটুকু উৎসাহ এই চিন্তাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁটার টানের মতই একনিমেষে সরিয়া গেল।"

কানাই সিং জিভ কাটিয়া ত্রস্তভাবে, "সে কি কথা রে বাবা! কেন তুই কার কাছে কি কছুর করিছিস্ রে বেটা হামার?" বলিয়া সস্নেহ আদরে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বহির্দ্বারে খটাখট খটাখট করিয়া অসহিষ্ণুভাবে কাহাকে কড়া নাড়িতে শোনা গেল।

রাজাবাবুর পত্রবাহক বিশ্বাসে দুইজনেই ত্রস্ত হইল। নতুবা এমন সুখজনক আলোচনার মধ্য হইতে কানাই সিংকে এত শীঘ্র কেহ উঠাইতে পারিত না।"

খানিক পরে উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, রাজাবাবুর লোক নয়, ব্যারিষ্টার সাহেব সুরমার দুদিনের কাজ কামাইয়ের কৈফিয়ৎ কাটিতে আসিয়াছেন। সে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে ববুয়ার এখন বড় অসুখ, দেখা কিছুতেই হইবে না। কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। শেষকালে কানাই সিংকে বিরক্ত দেখিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলেন, দেখা করাইয়া দাও তো এটা পাইবে! কানাই তাঁহাকে উত্তম মধ্যম ঝাড়িয়া দিত, শুধু পাছে ববুয়ার মনীবকে চটাইলে ববুয়া রাগ করে, তাই সে পারে নাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁদো কাঁদো গলায় সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "অমন নোকরী তুই করিস্‌নে খোকি! হামি রাজাবাবুকে বুল্‌বো তোর টাকায় আঁট নেই, আর কুছু বেড়িয়ে দিতে। হামার রাজাবাবু তেমন আদমী নয় যে দিবে না।"

কানাই সিংহের আনিত সংবাদে এদিকে সুরমার অবস্থা একেবারেই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আতঙ্কে আঁৎকাইয়া উঠিয়া সে দ্বারের দিকে সভয় দৃষ্টি রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "কিছুতে না, কিছুতে না, সিং-জী! দেখ যেন সে আমার বাড়ীতে না ঢুকতে পারে। তুমি যে করে হয়, তাড়াও ওকে, তাড়াও ওকে—যদি এখানে এসে পড়ে—শিগগির যাও।"

বিস্মিত কানাই সিং কি বলিবার জন্য মুখ খুলিতে গেলে, দারুণ অধৈর্য্যের সহিত সে তাহাকে ঠেলিয়া দিল, "আঃ যাও না সিং-জী, এক্ষুণি হয়ত এসে উপস্থিত হবে!"

কানাই সিং প্রস্থান করিলে ছুটিয়া আসিয়া সুরমা ঘরের সব

কয়টা দরজা জানালায় খিল আঁটিয়া দিল। তার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া যাইতেছে।

বিশ্বপ্রিয়বাবু পরের দিন সকাল বেলায় আসিয়া নিজের নাম ছাপা কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন; "সবিনয় নিবেদন, রাজাবাহাদুরের অনুরোধে আমিই আপনার জন্য মিঃ গুহর বাড়ীর চাকরী জোগাড় করিয়াছিলাম, যদি সেখানে কোন অসঙ্গত কিছু ঘটিয়া থাকে, তার জন্য আমিই প্রধানতঃ দায়ী এবং আমিই তার জবাব দিতে বাধ্য। সেজন্য আমার সব কথা জানাও প্রয়োজন। অতএব যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে মিনিট কতকের জন্য আপনার বাহিরের ঘরে আপনার কোন বিশ্বাসী লোকের উপস্থিতিতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে।"

পত্র লেখার ধরণে, বিশেষতঃ পূর্ব্বেই নরেশের পত্রে তাঁহার 'বন্ধু' বলিয়া ইহার উল্লেখ থাকায় সুরমা কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া রাস্তার ধারের অব্যবহারে পতিত আসবাবহীন বৈঠকখানা ঘরখানায় বিশ্বপ্রিয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

বিশ্বপ্রিয় তাহাকে নমস্কার করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং সবিনয়ে কহিল, "মিঃ গুহর কাছে কালরাত্রে শুনলুম, আপনি আর তাঁর স্ত্রীকে বাজনা শেখাতে যাচ্চেন না; আপনার না যাবার কারণ জানতে কাল তিনি এখানে এসেছিলেন, আপনি দেখা করেন নি, উপরন্তু আপনার চাকরের হাতে তিনি অত্যন্ত অপমানিত হয়ে ফিরে গেছেন।"

সুরমা আসিবার সময় নিজের রুক্ষচুলগুলাকে বিনা চিরুণীর সাহায্যে টানিয়া কুণ্ডলী করিয়া জড়াইয়া আসিয়াছিল। চোখে একজোড়া চোক ওঠায় সময়কার নীল চশমা ও গায়ে একখানা মোটা র‍্যাপারে নিজেকে লুকাইবার ইচ্ছায় ঢাকা দিয়াছিল। কিন্তু তার দিকে চোক পড়িতেই

বিশ্বপ্রিয় যেন আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। রাজা নরেশের আশ্রিতা যে এতটাই ছেলেমানুষ এ ধারণা তাঁর মোটেই ছিল না। আরও বিস্ময়বোধ হইল তার নিরাড়ম্বর ও অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া।—এ যেন একটা নেহাৎ সাদাসিদা স্কুলের মেয়ে! একে আর কিছু মনে করিতেই পারা যায় না।

ধীর এবং স্থিরকণ্ঠে সুরমা উত্তর করিল, "তিনি যা বলেছেন সবই সত্যি। শুধু তাঁকে অনুগ্রহ করে বলে দেবেন, আমি তাঁর বাড়ী চাকরী করবো না, তিনি যেন দয়া করে আমায় আর বিরক্ত না করেন।"

অনুমানে বুঝিয়া বিশ্বপ্রিয় কিছু দুঃখিত, কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন; মৃদু মৃদু বলিলেন, "রাস্‌কাল!—আচ্ছা, তাকে আমি দেখে নেবো—কিন্তু আপনার কাছে আমিই অপরাধী হয়ে পড়লেম। আচ্ছা এবারে আমি বিশেষ জানাশোনা ভদ্রঘর দেখে আপনার জন্য খুব ভাল চাকরী ঠিক করে দোব দেখবেন।"

সুরমা নতমুখে উত্তরে কহিল, "আমার আর চাকরী কর্ব্বার ইচ্ছা নেই।"

বিশ্বপ্রিয় সলজ্জে মাথা হেঁট করিলেন এবং তারপর নত মুখেই কহিলেন, "সংসারে মিঃ গুহ অল্পই জন্মায় এটাও মনে জান্‌বেন।"

সুরমা কহিল, "আমি সে ভালরূপই জানি। কিন্তু আমার স্থানও যে বড়ই স্বল্প-পরিসর। ক'জন ভদ্রলোক আমায় বাড়ী ঢুকতে দিতে রাজী হবেন?"

এই অকুণ্ঠিত ও নির্ভীক আত্মাভিব্যক্তিতে বিশ্বপ্রিয় একদিকে যেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তেমনি আর একদিক দিয়া ইহাতে তাঁর আলোচনার পথও মুক্ত হইয়া গেল। তিনি তখন ঘরের মধ্যের দ্বিতীয় চৌকিখানি টানিয়া দিয়া সুরমাকে বলিলেন, "বসুন—আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমি একটুখানি আলোচনা করতে চাই। কিছু মনে কর্ব্বেন

না—আপনার বিষয়ে রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে আমার যতটা জানা আছে, আর নিজেও যেটুকু আজ স্বচক্ষে আপনাকে দেখে আমি বুঝেছি—তা'তে চেষ্টা করলে সাধারণ সমাজ আপনাকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবে না বলেই আমার নিজের বিশ্বাস। আমি সব কথা জানিয়ে বিশেষরূপ চেষ্টা করবো এবং ধরে নিচ্ছি, তাতেও যদি না কৃতকার্য্য হতে পারি তা' হলে—"

বিশ্বপ্রিয় একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সমস্ত খবর পেয়েও কি ব্রাহ্মসমাজ আমায় তার মধ্যে স্থান দিতে প্রস্তুত হবে ?"

প্রশ্নের ধরণে, আর ঐ 'সমস্ত' কথাটার উপর জোর দিয়া বলাতে বিশ্বপ্রিয় মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিয়া একটু যেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া এক রকমে জবাব তৈরি করিয়া লইলেন, "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম' সমাজ সে কথাটা জানে বৈ কি এবং ক্ষেত্র হিসেবে জানাও উচিত !"

সুরমা নিজের অস্পষ্ট হইয়া পড়া কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল, "জন্মগত অপরাধের কথা নয় ;—যে অধিকারে মিঃ গুহ আমায় অপমানিত করাকে অপরাধ বা অন্যায় বোধ করেন নি, ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা কি আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি বদল করতে পার্ব্বেন ? অথবা আমি যা' আছি, লোকের মনে তাই থেকে যাব, অথচ যে দেব-দেবীদের আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি, বাইরে স্বীকার করতে বাধ্য হবো, তা' করিনে ?—আর যে নির্গুণ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই, আমি তাঁর উপাসক বলে লোক ঠকাবো !—এত পাপের বোঝার উপর আবার এতবড় প্রতারণাটা কেন করি ? হিন্দুসমাজে অবাধ মিশবার অধিকার আমার নাই থাক্, তবু তো হিন্দু।"

এর পর আর বিশ্বপ্রিয় কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দু' একবার ক্ষীণ

প্রতিবাদ চেষ্টা করিতে গিয়া পরাভূতবোধে শেষে অনেক চেষ্টায় দ্বিধা ও লজ্জা সংবরণ করিয়া তিনি অকৃত্রিম সহানুভূতির সঙ্গেই মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "এই সামান্য ক্ষণের কটিমাত্র কথায় আপনাকে আমি চিনে নিয়েছি! রাজার কথা—সত্য কথাই বল্‌বো—পূর্ব্বে আমার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু এখন আমি আপনার তেজস্বিতায় ও সরলতায় মুগ্ধ হয়ে সব কিছুই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে নিতে পেরেছি। আপনি আমাদের সমাজে আসতে চান; আমি সযত্নে আপনাকে সেই পথ দেবার চেষ্টায় যথাসাধ্য করতে আনন্দের সঙ্গেই প্রস্তুত হবো। আপনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মে না আসতে চান, তা'হলে আপনাকে নিরাপদ ও সম্মানের স্থান দেবার জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আপনাকে সিবিল ম্যারেজ অ্যাক্টে বিবাহ করতেও সম্মত জান্‌বেন। আপনার মত মহিলার এ অবস্থায় থাকা অনুচিত এবং যারা থাক্‌তে দেয়, তারাও অপরাধী।"

সুরমা তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উঁহাকে যোড়হাতে নতদেহে নমস্কার করিল। কৃতজ্ঞতার সজল করুণস্বরে কহিল, "আপনি আমায় যে কথা আজ বল্‌তে পারলেন, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন আমার মনে গাঁথা থাক্‌বে, কিন্তু আমি যে কোন সমাজের লোকেরই স্ত্রী হবার যোগ্যা নই। আমার সম্বন্ধে এখন থেকে আপনারা শুধু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করুন এই আমার একমাত্র ভিক্ষা।"

বিশ্বপ্রিয়রও আর বলিবার কথা যোগাইল না। দু'জনেই বিদায় লইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

"হ'ত ভাল যদি হ'তে কুৎসিত অথবা সে হ'তে বলী।
ভয়ে আসিত না ভালবাসিত না চরণে যেত না দলি।"
—তীর্থ সলিল

অশান্তির আগুন যখন জ্বলিতে আরম্ভ করে সে যেন আর নিবিতে চায় না। কোথা দিয়া ও কেমন করিয়া যে, রাজা নরেশচন্দ্রের সুরক্ষিত সুরমার সহিত তাঁর বিচ্ছেদের সংবাদ দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল বলা কঠিন! কিন্তু কলিকাতার ধনী মহলে যাঁহারা ও-সকল সংবাদ রাখিয়া থাকেন এবং নরেশচন্দ্রের সুন্দরী-আশ্রিতার সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ একটু আগ্রহ কৌতূহল এতদিন মনের মধ্যে চাপা ছিল, তাঁদের মধ্যের ছু'এক জন ধনীলোকের মোটর সুরমার দরজায় ধাক্কা মারিয়া গেল। কেহ বা পত্র, কেহ বা বন্ধু পাঠাইলেন। কানাই সিং হুকুম বরদারী করিল। রাজার পত্রবাহক ভিন্ন সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হুকুম ছিল—ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা কানাইয়ের স্বভাব, কানাই সে বিষয়ে কোন ত্রুটী রাখিল না। ইতিমধ্যে সিনেমা কোম্পানীর ছু' চারিজন ডিরেক্‌টার ও দালালেরও শুভানুগমন ঘটিয়াছে, সাক্ষাৎ না পাইয়া পত্র মারফৎ তার গানের জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীর লোক অনুরোধ জানাইয়াছে। কলিকাতার সৌখীন সমাজ এই অবরোধ-বাসিনী মেয়েটার জন্য এতটা যে উন্মুখ রহিয়াছিল, কে জানিত, শেষে ডাক্তার করুণানিধান বাবু একদিন দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কি করা উচিত ঠিক না পাইয়া কানাই সিং মুনিবকে খবর দিতে গেল। ডাক্তার নোটবুকের পাতা ছিঁড়িয়া পেন্‌সিলে লিখিয়া দিলেন— "সুরমা কাহারও সহিত দেখা করিতেছে না, তাহা তিনি শুনিয়াছেন,

কিন্তু তাঁর সঙ্গের কথা স্বতন্ত্র! তিনি সুরমার বাল্যকালে কতবার রাজা-বাহাদুরের সঙ্গে আসিয়া তার গান শুনিয়া গিয়াছেন, রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন সুরমা কি জানে না? তখন হইতেই তিনি সুরমার জন্ম পাগল, কেবল নরেশের বন্ধুত্বের খাতিরেই এতদিন চুপ করিয়াছিলেন। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়াছে—সুরমার রূপ ধ্যান করিয়াই তিনি আর নূতন করিয়া সং সাজিতে পারেন নাই!"

কানাই সিং ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "আজ নয়, আপনি কাল আসবেন।" এদের উদ্দেশ্য সেও এখন বুঝিতে পারিয়াছে। সুরমার কার্য্যে তার বুক অহঙ্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এবার তার সে অহঙ্কার চূর্ণ হইতে বসিল, ভাবিয়া সে মর্ম্মে আঘাত পাইল।

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণচিত্তে নিজের খাটিয়ায় বসিয়া পড়িয়া সবেমাত্র উচ্চারণ করিয়াছে, "সীতারাম!—সীতারাম!"—এমন সময় উপর হইতে ডাক আসিল, "সিং-জী!"

মুখভার করিয়া কানাই গিয়া নিরুত্তরে কাছে দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, ঘরের মেজেয় বসিয়া সুরমা চোখ মুছিতেছে, বোধ করি সে কাঁদিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই সে আহত-শিশুর ন্যায় ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মর্ম্মবিদারী স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "সিং-জী, ভাইয়া! আর তো আমি এদেশে থাকতে পারচিনে! তোমার দেশে তুমি আমায় আজই নিয়ে চলো। এক্ষুনি নিয়ে চলো।"

কানাই সিং এই দুদিনের ব্যাপারে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া ছিল। সে যেমন প্রীত তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া রুখিয়া উঠিল, "বউয়া! তুই কাঁদিস্ নে। তুই হামার বেটী আছিস, বেটীসে বড়্ করে হামি তোকে মেনিছি, হামি তোর হুকুম পেলে ওই দুষমন্-বাবুদের নাক তুড়িয়ে দিতে পারি! তুই হুকুম দে—দেখি তোকে কোন জানোয়ার কাঁদাতে আসে।"

সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কানাই ভাইয়া! কারুকে আমি কিছু বলবো না, ওদের দোষ কি? ওরা চিরদিন আমাদের মতন লোকেদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে আসতে পেয়েছে, ওরা তাই জানে। আমাদের মধ্যেও যে মানুষের প্রাণ আছে, ইজ্জত বোধ আছে, তা'তো কোনদিন কেউ ভাবতে শেখেনি। সমাজ তো আমাদের রক্ষার কোন উপায় করেনি। কেউতো আমাদের দোরে দোরে গিয়ে উদ্ধারের মন্ত্র শোনায়নি। আমাদের নিয়ে শুধু পুতুল খেলাতেই পেরেচে। আমরা যে মানুষ সেটুকু শুদ্ধু ভু'লে গিয়েছে। ওদের বলবার আছে কি? এর জন্য আমরাও তো কম দায়ী নই। শুধু ওরাই নয়, আমরাও যে ভু'লে গিয়েছিলুম যে আমরাও মানুষ।"

কানাই সিং রাগিয়াই ছিল, সে তেমনি উদ্ধতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "রাজাবাবুরই তোর খবর না লেওয়া খুব কসুর হচ্চে। হামি এখনি গিয়ে সব হাল ওঁকে জেনিয়ে আসচি।"

"সিং-জী ভাইয়া! আমায় একলা ফেলে তুমি যেওনা।—আমায়ও তবে সঙ্গে করে নিয়ে চলো।"

কানাই যেন এতক্ষণের পর নিজে আশ্বস্ত হইবার পথ পাইয়া উহাকেও আশ্বস্ত করিতে চাহিল। বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, "তাই চল্ বহুয়া! তাই চল্। হামার রাজাবাবু তোকে দুক্ষু পেতে দেবে না। এমনি করে থাকিলে তুই মরিয়ে যাবি।"

বেলা তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। রুদ্ধদ্বার কক্ষ মধ্যে পাখার হাওয়ায় গ্রীষ্মতাপ কিছুই অনুভূত হইতেছিল না বটে; তবে বহির্জগতে তখনও পচা ভাদ্রের রৌদ্রতপ্ত দীর্ঘ বেলা অবসানের পথে আলস্য-শ্লথ গতিতে ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতেছিল, যাইবার বিশেষ তাড়া ছিল না। পশ্চিমাকাশে সূর্য্যের দেখা নাই; কিন্তু প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী

রাজার শাসনকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও যেমন তাঁর শাসন-প্রভাব কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁর শাসিত প্রদেশকে প্রভাবান্বিত রাখে, তেমনি তাঁর মহিমাজাল তখনও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে গৌরব বিস্তৃত করিতেছিল। নরেশচন্দ্র আফিস ঘরে দু'জন কর্ম্মচারীর সহিত কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন; উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় কানাই সিং দ্বারে দাঁড়াইয়া বারকতক কাশিয়া নিজের পরে দৃষ্টি আকর্ষিত করিয়া লইল এবং দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া ডাকিল, "মহারাজ!"

"কে? কানাই সিং?—যুগল! পালমশাই! আজ আমি এইবার উঠি, কাল আর একবার ঐ খসড়াটা ভাল করে দেখেশুনে দেওয়া যাবে।"

নরেশ কানাই সিংয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের খবর সব ভাল তো কানাই সিং?" হাতে চিঠি আছে কিনা উদ্বিগ্ন চোখে দেখিয়া লইলেন।

কানাই সিং দুঃখিতভাবে মাথা নাড়া দিয়া জানাইল, "খবর কাঁহা কুছু আচ্ছা হ্যায়, মহারাজ! বহুয়াজী বহোত তকলিবসে হ্যায়! হাম উন্‌কো ইঁহা লে' আয়া।"

"এখানে নিয়ে এসেছ!—তাকে!—" নরেশ যেন আতঙ্কিত ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন—"কি হয়েছে তার?—আমায় খবর দিলেই হোত।"

কানাই সিং সুরমাকে সত্যসত্যই ভালবাসিয়াছিল, একেই সে সুরমার প্রতি 'মহারাজের' ব্যবহারকে প্রশংসা করিতে কোনমতেই সমর্থ হয় নাই, তার উপর ইঁহার সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অথচ সুরমার অর্থাভাবে অবমাননাজনক চাকরী করিতে যাওয়া। বিশেষতঃ তাহারই পরিণামে এতবড় দুঃখভোগ, তার মনকে অত্যন্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এক্ষণে সুরমার আগমন সংবাদে নরেশকে একান্ত চঞ্চলচিত্ত দেখিয়া সে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। মনীবের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া সে

অভিমান-পরিপূর্ণ তিক্ত স্বরে জবাব দিল, "মহারাজ! হুকুম ফরমাইয়েতো হাম হামারা বউয়াজীকো আপনা দেশপর—যাঁহা হামারা বেটী-পুতো সবকোই হ্যায়, হুঁয়াই লে' চলে?—লেকেন গরীব পরবর!—গরীবকা বাচ্চে' পর এইসা বে খেয়াল হোকে রহ্না ঠিক বাত নেই! দুষমন বাবুলোক সব এইসা দিকদারী লাগায়া বোলনেই সেকে।"

ভৃত্যের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নরেশচন্দ্রের চিন্তা-বিপন্নতা গভীর লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। আত্মচিন্তায় বিরত হইয়া তখন আস্তে আস্তে উহাকেই প্রশ্ন করিলেন, "সে কোথায়?"

গাড়ীর মধ্যে ফটকের বাহিরে আছে শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কানাই সিংয়ের সহিত সেই দিকে চলিয়া গেলেন।

পিছনে কর্ম্মচারী দুজনের মধ্যে যুগল তখন নিম্নস্বরে অপরজনকে সম্বোধন করিল, "ব্যাপারখানা শুনলেন তো, পাল মশাই! বাইজী-সাহেবা যে বাড়ী চড়োয়া হয়ে এসে উপস্থিত হলেন দেখছি! আসা যাওয়া কমেছে কি না, অম্নি গেরো কষতে বাড়ী বয়ে ছুটে এসেছেন।"

পালমশাই চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া মুচকি হাসির সহিত টিপ্পনী কাটিল, "ভাইরে! ওরা হলো জলের কুমীর! ওদের দাঁতের মধ্যে যার গর্দ্দান পড়েচে, সে কি আর তা বার করে নিতে পারে? এতো আর রাঘব বোয়াল নয় যে মঙ্গলচণ্ডীমায়ের হুকুমে উগ্রে দেবে!"

"এইবারেই আমাদের রূপসী-রাণী ঠাকুরুণটীর সিংহাসন টলমল হলো! যাকগে। ভাই রে। আমার কিন্তু একবারটী ওর রূপখানা দেখে চক্ষু সার্থক করতেই হবে, অনেক দিনের সাধ! শুনেছি নাকি মাগীটে আরমানী বিবি।"

পাল কহিল, "দূর্ ছোঁড়া! আরমানী কেন হতে যাবে?—ছুঁড়িটা খাটী কাশ্মীরী রে!"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মোরে পুষ্প দিলে বলে পুড়িছে অন্তরে
পুড়িয়া মরুক পুষ্প দিব কেন তারে ?

—মহাভারত

পরিমল মুক্তার মালা জড়ান খোঁপার উপর একটি পাতাশুদ্ধ সাদা গোলাপ পরিয়াছে। গায়ে দিয়াছে গোলাপী বেনারসীর হাতখোলা জ্যাকেট, সেটীও বোম্বাই মুক্তায় খচিত এবং মুক্তার স্থূল ঝালরগুলি তার নব কিসলয় চিক্কণ স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যে ভরা অনতিস্থূল মসৃণ বাহুর উপর অতি সুন্দরভাবে দোল খাইতেছিল। কানের হীরা কয়খানা সন্ধ্যা শুক-তারার মতন উজ্জ্বল এবং গলায় একাবলী মুক্তার হারটীও তেমনি সুচিক্কণ ও সুগোল। ছোট ছোট গোলাপ ঝাড়ের বুটাকাটা সন্ধ্যাকাশের মতই সমুজ্জ্বল গোলাপী আভাযুক্ত সাড়ীর আঁচল হীরার পিনবদ্ধ, হাতে একখানা পালকের পাখা—এইরকম সাজগোজ করিয়া সে সান্ধ্য আকাশের শোভা দেখিতে ছাদে উঠিয়াছিল—অন্নদা আসিয়া জানাইল রাজাবাবু ডাকিতেছেন। পরিমলের মন যেন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সকল ভূষা তখনই সার্থক হয়, যখন এই সাজান দেহ তার যথার্থ আদরের পাত্রের আদরের স্পর্শ ও প্রশংসার দৃষ্টি লাভ করে।

"কি গো! কি ভাগ্যি! আজ যে এমন অসময়ে গরীবখানায় রাজামশাইএর পায়ের ধুলো পড়লো? বলি কোন্‌দিকের সূর্য্যি আজ কোন্‌দিক দিয়ে অস্ত গেলেন?"—বলিতে বলিতে উদ্বিগ্নমুখে তারই দিকে অগ্রসর স্বামীর মুখ সে দেখিতে পাইল। তার কঠিন মুখভাব

লক্ষ্যে তার আনন্দোত্তেজনা মুহূর্তে স্রোতোহত হইয়া গেল। উদ্যত অধরের সরস হাস্য নিরুদ্ধ রাখিয়া উৎসুকনেত্রে উঁহার হাস্যলেশহীন উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভরসা করিয়া কোন প্রশ্নই করিল না।

নরেশ তার দিকে একসেকেণ্ড মাত্র চাহিয়া 'এসো' বলিয়া নীরবে ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইলেন। গলার স্বরে একটা কোন অভাবনীয় ব্যাপারের আভাস পাইয়া পরিমল চমকিয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

নরেশ ঘরে আসিয়া পরিমলের দিবানিদ্রা উপভুক্ত বিছানাটার একধারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন, পরিমল নিকটে আসিতে নিজের পাশে জায়গা দিয়া সন্দেহ শঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পরিমল! আজ আমাদের মস্ত পরীক্ষার দিন! তুমি যদি আজ অকপটে আমার সাহায্য করো, তবেই আমি রক্ষা পাই।"

পরিমল কোন অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়া কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবো বলো?"

নরেশচন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন,—কি করিয়া কথাটা আরম্ভ করিবেন তার ভাষাই যেন খুঁজিয়া মিলিতেছিল না। চিত্ত তাঁর সঙ্কট মুহূর্তে বড় দুর্ব্বল বোধ হইল। পরিমলের অবস্থাও এই সময়টুকুর মধ্যে উঁহার চেয়েও যেন শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কি শুনিবে সে যে তার আন্দাজ করিতেও পারিতেছিল না!

খানিকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেশ তাঁর বক্তব্যটা গুছাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "একটী অনাথা মেয়ে সংসারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করে আমাদের দ্বারস্থ হয়েছে, তুমি যদি তাকে দয়া করে আশ্রয় দাও।"

বুকে চাপিয়া ধরা প্রবল আতঙ্ক একখণ্ড স্বচ্ছ শরৎ মেঘের মতই ভাসিয়া গেল! স্বামীর বিষণ্ণ চিন্তিত মুখের উপর কৌতুকপূর্ণ হাস্য-স্মিত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ভৎর্সনার স্বরে কহিয়া উঠিল, "ও মাগো! কি মানুষ তুমি! আমি বলি কি না জানি হয়েছে!"—বলিয়াই স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া তাঁর গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া সুখের আবেগে গলিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, "তাব'লে অতটা হিংসুটে আমায় তুমি মনে করো না! এতলোকে তোমার বাড়ী আশ্রয় পাচ্চে; আর সে মেয়েমানুষ বলেই আমি বুঝি তাকে রাখতে দিলে হিংসেয় বুক ফেটে মরেই যাবো। তুমি এই বুঝি আমায় মনে করো? বেশতো রাখ না তাকে, এক্ষণি থেকে যাক না। কোথায় সে?"

নরেশ স্ত্রীর আলিঙ্গনের ও অনুতপ্ত আদরের মধ্যে অপরাধ বিব্রত হইয়া পড়িয়া তার দিকে না চাহিয়াই সাহস ভরে বলিয়া ফেলিলেন, "এর ভার তোমায় আজ থেকে নিতে হবে। আমি না বুঝে এতদিন ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর তার ফলেই আজ ওর এই বিপন্ন দশা! তুমি এবার ওকে সেই দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোমার স্বামীর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে, আমার পরি-রাণি!" নরেশ স্ত্রীর মুখে সাগ্রহ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

পরিমল নিজের আনন্দ-স্মিত দৃষ্টিতে কৌতুক ও কৌতূহল ভরিয়া কি কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ যেন কি বুঝিয়া লইল। সন্দিগ্ধস্বরে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল, "মেয়েটির নাম কি?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্যে নরেশ একটু থতমত খাইয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "সুরমা। সে—"

পরিমলের আদরভরা বাহুর বাঁধন স্বামীর কণ্ঠ হইতে শিথিলিত হইয়া খসিয়া পড়িল। শুষ্ক ফুলের মধ্য হইতে যেমন করিয়া কঠিন

ফলের গুটি বাঁধিয়া উঠে, তেমনই করিয়া তার আনন্দ বিকশিত প্রফুল্ল মুখের সমুদয় রেখাগুলি অত্যন্ত কঠোর হইয়া দেখা দিল। সে নরেশের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গিয়া দৃপ্তভঙ্গিতে মুখ তুলিয়া ত্বরিতকণ্ঠে কহিল, "আমার বদলে যদি রাজা ভুবনমোহন মল্লিকের মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে, তাহলে কি আজ আমার কাছে যে কথা বলতে পারলে, সেই কথা তার কাছে তুলতে ভরসা করতে? নিতান্ত গরীব বলেই না আমায় তুমি তোমার রক্ষিতার সঙ্গে একত্রে বাস কর্ব্বার কথা বলতে দ্বিধা পর্য্যন্ত করলে না!—কিন্তু জেনো, গরীব হলেও আমি ছোট লোকের মেয়ে নই, দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে একবাড়ীতে থাকতে পারবে।"

নরেশ এই অপ্রত্যাশিত ক্ষুব্ধ স্বরের তীব্র তিরস্কারে যেন অবাক্ হইয়া গেলেন। সুরমার পরিচয় যে ইহার নিকট কিছুমাত্র গোপন নাই, মায় তার নাম পর্য্যন্ত—এ তাঁর জানা ছিল না; তাই এই কথার ঘায়ে সকল আশাই তাঁর ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া ক্ষণকাল সুরমা সম্বন্ধে নিজের অবিমৃষ্যকারিতার অনুতাপ ধিক্কারে নীরব হইয়া থাকিলেন, পরে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যদি আমায় একটুও ভালবেসে—একটুও শ্রদ্ধা করে থাক পরিমল! তা'হলে নিজের অভিমান ছেড়ে দিয়ে আমার এই বিপদের দিনে আমার সহায় হও! পরের মুখে অনেক কথাই শুনা যায়, তার মধ্যে অনেক অসত্যও থাকে; আগে সকল কথা নিরপেক্ষভাবে জেনে বিচার করে দেখে রায় দিতে হয়। সুরমাকে আমি এতটুকু কচি মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এক রকম মানুষ করেছি। তার জন্ম অপবিত্রা মায়ের গর্ভে; কিন্তু নিজে সে অতি পবিত্র। তাকে একপাশে একটু স্থান দিলে তোমার বাড়ী নিতান্তই কলঙ্কিত হবে না। যে সব কি

চাকরানীদের তোমরা বাড়ীতে ঢুকতে দাও, তাদের চেয়েও কি ও নিকৃষ্ট!"

পরিমল স্বামীর বেদনাহত ও একান্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনের মধ্যে একটা দৌর্ব্বল্য বোধ করিল। কিন্তু সে মনোভাব স্থায়ী রহিল না। পুরাণো কথা মনে পড়িয়া গেল। সৎ-শাশুড়ী, বৈমাত্র-ননদ, অন্নদা ঝি সবাই যে এ বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সংবাদ ষোড়শোপচারে সাজাইয়া তাহাকে নৈবেদ্য দিয়াছে! শাশুড়ী এমন কথাও জানাইয়াছিলেন যে, "নরেশের তো বিয়ের সাধে বিয়ে নয়; নেহাৎ লোক দেখাবার জন্যে একটা বউ এনে ঘরে পুষে রাখা!" ননদ বলিয়াছিল, "সুরমা ব'লে দাদার যে বাইজী আছে, তার মতন সুন্দরী নাকি বাংলাদেশে জন্মায়নি! পাছে তার হিংসে হয় তাই না দাদা আমার মাসীর মেয়েকে ছেড়ে তোমায় বিয়ে করল। নৈলে তুমি কি ভাই এ ঘরে আসতে পেতে!" আবার কেহ বলিয়াছে, "সেই তো সর্ব্বে-সর্ব্বময়ী, তা' এই কালো বউকে কোনদিন না তার বাঁদী হতে হয়!"

সেই হৃদয়ভেদী তীক্ষ্ণ তীরগুলা যে পরিমলের মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, ভুলিতে তো পারে নাই। তাই নিষ্ঠুর ও কঠিন হইয়া থাকিয়া সে অবিচলিত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার এত বাগান, এত বাড়ী, চারিদিকে পড়ে, সে সবের অধিকার ত তুমি ওকে দিলেই পারো।—শুধু আমায় যেটুকু ভুল করে দিয়ে ফেলেছ মাত্র সেইটুকু ছাড়া!—ও যদি স্বর্গের দেবীও হয়, তবু আমার কাছে ওর এতটুকু জায়গা হবে না।"

এবার চিরসহিষ্ণু নরেশের মনও একান্ত অধৈর্য্য ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তিনি প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "কি তার অপরাধ?"

পরিমল দেহ ঋজু ও মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্বামীর মুখে নিঃসঙ্কোচে তুলিয়া ধরিল, স্পষ্টস্বরে কহিল, "তার অপরাধ এত বেশী যে তাকে দেওয়া ভালবাসা ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব বোধে, তুমি আমার মত তুচ্ছকেও তুচ্ছ করতে পারো নি!—কিন্তু রাজাবাহাদুর! সেইখানেই মস্ত বড় ভুল করেছিলে! রাজার মেয়েরও যেমন, ভিখারীর মেয়েরও তেম্‌নি, মন বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বুকের ভিতর একই রকম ভরা আছে!—তুমি যাকে ভালবাস, তাকে আমার পাশে বসে ভালবাসার সুযোগ আমি তোমায় কিছুতেই দিতে পারবো না। যদি তাকে এ বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব দেবে বলেই স্থির করে থাকো,—হুকুম করো—আমিই বাগানে গিয়ে থাকি। এক বাড়ীতে ভদ্র কন্যার, আর পতিতার মেয়ের থাকা চল্‌বে না।"

নরেশকে একেবারেই স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক দেখিয়া নিজের উদ্গত-অশ্রু কোন মতে সম্বরণ করিয়া লইয়া রোষক্ষুব্ধ ও উচ্ছ্বসিতস্বরে পুনশ্চ কহিল, "কিম্বা বাগানও যদি তাঁর হাওয়া খাবার জন্যে দরকার পড়ে যায়, কাজ নেই আমায় তা' দিয়ে।—আরও নিশ্চিন্ত হতে পার্ব্বে, দেশের বাড়ীতে নতুন মায়ের কাছে আমায় বরং পাঠিয়ে দে'বার ব্যবস্থা করে দাও,—আর ততক্ষণের জন্যে শুধু তোমার তাঁকে—এই নাও, এই মুক্তোর মালা, হীরার দুল, আংটী, ব্রোচ সমস্তই খুলে দিচ্ছি, পরাওগে তাঁকে, কিছু চাইনে আমি। ওঁর নয়, নতুনমারই দাসীবৃত্তি করে খাবো তাতেও ইজ্জত আছে।"

নরেশ একটা সুদীর্ঘতর নিঃশ্বাস মোচন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অত্যন্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "পরিমল! বিপন্ন আশ্রয়ার্থীকে তোমার দয়ার মধ্যেই সঁপে দিতে চেয়েছিলেম—সেটা তুমি এতটা ছোট করে নেবে জান্‌লে সে চেষ্টা করতেম না। ভাল—তাকে একবারটী নিজের চোখেই

না হয় দেখ—ভাল মন্দ লোক তো চোখে দেখেও অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। ডাকি তাকে ;"

পরিমল দু'হাত দিয়া দু'চোক ঢাকিয়া সবেগে মাথা নাড়িল—"না, না, আমার স্বামীকে আজও যে আমার কাছ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে, আমি তার মুখ দেখবো না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

তখন রমণী কাঁদিয়া পড়িল সাধুর চরণমূলে
কহিল, "পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে ?"
—কথা

নীচের তলার একটা বাড়তি ঘরে সুরমা একাকিনী ঘরের পাথরের মেজের উপর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যেন একগাছি ছিন্ন লতার মতনই বসিয়া পড়িয়াছিল। রাজা নরেশচন্দ্রের এই বিপুল ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রাসাদ ভবনে প্রবেশ করিয়াই তার সমস্ত মনটা যেন লজ্জার-অনুতাপে ও সঙ্কোচে-ধিক্কারে গুটাইয়া একেবারে ছোট হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক ও নিরুপায়তার ভয়ের তাড়নায় কানাই সিংয়ের প্রস্তাবিত এই কাজটা করিয়া ফেলিবার পরক্ষণ হইতেই মনের মধ্যে তার অস্বস্তির ঝড়, তুফান তুলিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছিল। নিশ্চিন্তে নিদ্রিত গৃহস্থের সুখনিদ্রার অবসরে তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে যেন চুরি করিতে আসিয়াছে, এম্‌নি একটা প্রচণ্ড দ্বিধা সে অনুভব করিতে লাগিল। যখন নরেশ তাঁর স্ত্রীর সম্মতি আনিতে গেলেন, তাঁর ফিরিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তার মধ্যে অকথ্য লজ্জা ও অত্যন্ত তীব্র সঙ্কোচে সুরমার যেন উঠিয়া সে ঘর, সে বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা অদম্য হইয়া উঠিতেছিল। ছি ছি! কেন সে মরিতে এ বাড়ীর পবিত্রতার মধ্যে—উঁহাদের দাম্পত্য সুখের মাঝখানে নিজের এই কলঙ্ক-লাঞ্ছিত পাপছায়া ফেলিতে আসিয়া দাঁড়াইল ? সে কি এ ঘরে প্রবেশ করার যোগ্য !—

নরেশ আসিয়া সঙ্কোচ-মৃদু চরণে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়া সুরমার মনের ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিমিষেই নিবিয়া

গেল। সে মুখ তুলিল না, নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল না, প্রশ্ন মাত্র না করিয়া যেমন তেম্‌নি নিষ্ক্রিয় রহিল। শুধু এতক্ষণের পর একটা প্রবল রোদনোচ্ছ্বাস ভিতরে ভিতরে বক্ষকে তার বিমথিত ও কণ্ঠকে উৎপীড়িত করিয়া অতি তীব্র বিস্ফোরকের মতই বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ এম্‌নি ভাষাশূন্য অসহ্য নীরবতার মধ্য দিয়া নিজেদের অসহনীয় বেদনাকে ঈষন্মাত্র প্রশমিত হইয়া আসিবার অবসর দিলেন। তারপর নিজ মনের চক্রাকারে মথিত ক্রোধ ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের জ্বালাকে কথঞ্চিৎ দমনে আনিয়া, নরেশ যথাসাধ্য শান্তভাব অবলম্বনের চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "চলো সুরমা! তোমায় এখনকার মতন আমার বেলগাছিয়ার বাগানে নিয়ে যাই।"

সুরমা এই কথাটুকুর মাঝখান দিয়া যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও বুঝিয়া লইয়া এইবার তার নৈরাশ্য ভয় ও বেদনা বিহ্বল চক্ষু দুটি সুধীরে উঠাইয়া নরেশচন্দ্রের গম্ভীর ও স্থির সঙ্কল্পপূর্ণ দুই চোখের উপর স্থাপন করিল, বলিল, "কানাই সিংয়ের দেশেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। তার বুড়ি মা আছে, মেয়েরা বউয়েরা আছে, তাদের মধ্যে আমি বেশ থাকতে পারবো। —আপনার বাগান বাড়ীতে আমি যাবো না।" বলিতে বলিতে সুরমার কণ্ঠে ভৎর্সনার কঠোরতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সেকথা কানে না তুলিয়াই নরেশ কহিলেন, "বেদানা! আমার স্ত্রী হয়ত ঠিকই মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। আজও হয়ত আমি তোমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসি—অথচ এই আমার জন্যেই তুমি বিশ্বের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার তরঙ্গে প'ড়ে, হাবুডুবু খেতে খেতে অসহায় অনাদৃত ভেসে বেড়াচ্ছো, আর আমি নিজেকে গৌরব ও সুখ সম্ভোগ করাচ্ছি! না, আর তা' হবে না! আজ রাত্রেই তোমায় আমি বিয়ে করবো। বলতে তো

কেউ কিছুই বাকি রাখেনি। যার যতখুসী প্রাণভরে নিন্দা করুক, আমি কারু কথাই গ্রাহ্য কর্ব্বো না, তোমারও না। তুমি আমার স্ত্রী!"

সুরমা নরেশের কথার ভঙ্গীতে ও দৃঢ় কণ্ঠস্বরে অবাক হইয়া গেল। সভয়নেত্রে তাঁর ক্রোধপরুষ ও আবেগোত্তেজিত মুখের দিকে চকিত কটাক্ষপাত করিল। তারপর তাঁর পায়ের কাছে পড়িয়া আকুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসের মধ্যে বলিতে লাগিল, "না, না, সে আমি হ'তে দোব না, কিছুতে না—আমি জন্মের মতন বিদায় হয়ে চলে যাচ্ছি! আর কক্ষনো আমার নামও আপনি শুনতে পাবেন না, এবারকার কথা দয়া করে শুধু ভুলে যাবেন।"—সে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

নরেশ তার কাছে একটু অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি ভুলে যাচ্চো বেদানা! তোমায় কক্ষন ত্যাগ করবো না বলে তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিবাহ ভিন্ন অন্য রকমে তোমায় আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই যে কত কঠিন হয়ে উঠছে সে তুমি তো দেখছো? অগত্যা এতে ভালমন্দ যাই হোক, এই আমাদের শেষ পথ, এর পরিণাম যা' হ'বার হোক গে'—আমি কোন কিছুই আর গ্রাহ্য করিনা!"

নরেশের এ মূর্ত্তি সুরমা কখন দেখে নাই, সে ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

নরেশ কহিলেন, "উপায় নেই সুরমা! আমার দোষ দিওনা, সব রকম চেষ্টাই আমি করেছিলুম। নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলেও— না, অন্য কোন উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই উপায় খোঁজবার। এসো আমার সঙ্গে।"

সুরমা তখন বিষাদ সমাচ্ছন্ন অশ্রু-ধৌত মুখ উন্নমিত করিল, দুঃখের

অশনি প্রহারে ফাটিয়া পড়া অন্তরের ব্যথা চাপিয়া অশ্রু প্রবাহের মধ্যেই অত্যন্ত করুণ একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া সে উত্তর দিল, "একটা খুব সহজ উপায় আমার হাতে এখনও কিন্তু আছে! সেটা ভুলে যাবেন না। অপরের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্তে সেটা আমি, আপনি দুঃখ পাবেন বলেই নির্ব্বাচন করতে ভরসা করিনি, কিন্তু যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হ'ন—তা'হলে—অগত্যাই সেই পথটাকেই আমায় বেছে নিতে হবে!—আমি মরবো।"

নিরতিশয় ব্যথা ও লজ্জানুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'হলে আমায় তুমি কি করতে বলো? স্রোতের মুখে তোমায় এমনি করেই ভাসিয়ে দোব?"

সুরমা তাঁর গম্ভীর ও শোকাহত মুখের দিকে চাহিয়া নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইল। অনেকখানি শান্তভাবেই জবাব দিল, "সামান্য কিছু টাকা দিন, কানাই সিংয়ের দেশেই আমি যাব।"

নরেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া অসহিষ্ণুভাবে চলিয়া গেলেন। কিছু পরে ফিরিয়া দেখিলেন, সুরমা তখন আর একা নাই, তার সঙ্গে নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

নরেশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিরঞ্জন একঝলক আনন্দের হাসির সহিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এ যে আমার সেই আনন্দময়ী"—

সুরমা ত্রস্তে বাধা দিল, "আমায় অমন কথা বলবেন না—আমি আপনার অতি দীন হীনা মেয়ে যে, বাবা!"

নরেশ নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, "তোমাদের দুজনে চেনা-শোনা হলো কি করে?"

শুনিয়া হঠাৎ নরেশ যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক ক্ষীণ আলোক রেখার সন্ধান পাইলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন! যাকে

মা বলে উল্লেখ করতে যাচ্ছিলে, একান্ত অসহায়া জেনে অনেক মন্দলোকে তার সঙ্গে অত্যন্ত কুব্যবহার করতেও দ্বিধা করছে না! তার রক্ষার ভার তুমি যদি নাও, তা'হলে আমি বড় নিশ্চিন্ত হই। আমি তোমায় চিনেছি। তুমি আমার চেয়েও এ কাজের ঢের বেশী উপযুক্ত। —আমার নিজের মধ্যেও একটা প্রচণ্ড লোভের আগুন এখন পর্য্যন্ত জলন্ত হ'য়ে রয়েছে, কিন্তু তুমি ওকে 'মা' বলছে—তুমি ওকে আমার কাছ থেকেও রক্ষা করতে পারবে। আমি তো ওকে ও-চোক নিয়ে দেখিনি!"

নিরঞ্জন অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত তার এ নূতন চাকরী এক মুহূর্ত্তেই স্বীকার করিয়া লইল। তখন স্থির বিজলীর মত চোক দুটী নরেশের সগুচিন্তাভারবিমুক্ত ঈষৎ প্রসন্নমুখে স্থাপন করিয়া সুরমা কহিল, "কিন্তু কার ভার ওঁকে নিতে হচ্চে, সেটা আমার সঙ্গে যাবার আগেই বাবার তো জেনে যাওয়া উচিত?"

এই বলিয়া নরেশকে বাক্য-বিমুখ দেখিয়া সে নিজেই নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া অকম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "আমি একজন অতি হীনজীবী পতিতার মেয়ে, বাবা! সমাজে আমার জায়গা নেই বলে, অত্যন্ত ছোট বেলা থেকে রাজাবাহাদুর দয়া করে আমায় একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে লালন পালন করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষে সর্ব্বদা যা' হয়ে থাকে, সেই ধরেই সবার বিচার করে। লোকে আমার জন্য ওঁর দেবচরিত্রেও কলঙ্কের কালি মাখাতে ছাড়ে নি। স্বাধীনভাবে কোন চাকরী নিয়ে ওঁর দেওয়া আশ্রয় ছাড়লে হয়ত কালে আমার ও ওঁর নাম পৃথক হয়ে পড়বে, এই আশা করেছিলুম।—হিতে বিপরীত হলো! ভয় পেয়ে আজ এখান অবধি—আমার দুষ্প্রবেশ্য জেনেও জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এসেছিলেম! আমি হয়ত ওঁর সকল সুখের রাহু!"—বলিতে বলিতে

আকস্মিকোদিত বাষ্পবেগে কণ্ঠরোধ হইয়া সুরমা চুপ করিয়া দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করাতে, তার চোখের জল সাদা পাথরের মেজের কঠিন বক্ষ আর্দ্র করিয়া নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নিরঞ্জন সব কথা শুনিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বলিল, "মা! সমাজ বন্ধনের মধ্যে জাতি নীতি কুল গোত্র এ সমুদয়ের নিশ্চয়ই দরকার আছে, কিন্তু তার বাইরে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে শুধু চাই চরিত্র ও ত্যাগ। তোমার ক্ষুদ্র ইতিহাসে ও-দুটি জিনিষই প্রচুর পরিমাণে দেখতে পেলুম! মাগো! আমরা মায়ে ছেলেতে যদি কোন সেবাশ্রম যদি কোন পুণ্যক্ষেত্রের সন্ন্যাসী-পরিচালিত কর্ম্মশালায় সন্ন্যাস-গ্রহণ করে কাজ করি, তা' হ'লে তোমার মা কি ছিল, সে প্রশ্নও যেমন অনাবশ্যক হয়ে যাবে এবং তোমার সম্বন্ধে কে' কি বিষ ছড়িয়েছে সেও হবে তেমনি অবান্তর।"

নরেশ গভীর আবেগে নিরঞ্জনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ নিরঞ্জন! সুরমার মত মেয়েরা যখন সমাজের জন্য নয়—তখন ওদের পক্ষে কোন সামাজিক জীবের আশ্রয়ও অসঙ্গত। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কথাবার্ত্তা কইবো। ওদের মতন মেয়েদের জন্য একটি সন্ন্যাসিনী-পরিচালিত রক্ষা-আশ্রম করতে পারার বোধ হয় খুবই দরকার আছে।"

নিরঞ্জন উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এক সময় আমার মনে এ সম্বন্ধে একটা কল্পনা ছিল। মিসনরীরা যেমন পথে কুড়নো (ফাউণ্ডলিং) ছেলে মেয়েদের জন্য আশ্রয় করে রাখে, হিন্দুসমাজ থেকে কেন সেরকম করা হবে না? যে সব পতিতা-নারী, বা পতিতার মেয়ে, সুপথে ফিরতে চায়, তাদের আশ্রয় কোথায়? এই আমার সুরমা-মায়ের মতন নিষ্পাপ হয়েও যারা মায়ের পাপে এ জন্মটা সমাজের বাইরে অথচ সৎপথে থেকে

দৃঢ় তপস্তায় ক্ষয় করতে সমর্থ, তারা কেন সে স্থযোগ পাবে না? বৈষ্ণবের আখড়া বা মঠধারীদের আড্ডা যথার্থ রক্ষামন্দির নয়, সে জ্ঞান সকলের নেই। কিন্তু সৃষ্টি ত এই উদ্দেশ্যেই হয়েছিল। এদের দ্বারা কত কাজ এখনও চেষ্টা করলে করিয়ে নিতে পারা যায়। যে কাজ মিসনরী মেয়েরা এবং তাদের পালিতারা করছে সে সবই তো এরা পারে। এ অভাগা দেশে কাজ কি কম আছে? তবে কেন এত শক্তি অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে? পথভ্রষ্টদের জন্য পথ কি সহজ করা হবে না?"

স্থরমা দুজনকার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া আনন্দ সজল চক্ষু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিয়া নিরঞ্জনের কদাকার মুখের দিকে চাহিল। গাঢ়স্বরে কহিল, "বাবা! আমায় ওই রকম করেই তুমি সার্থক করে তোল। এখন আমার মনে হচ্চে, আমার মতন হতভাগ্য জীবনেরও হয়ত দরকার কোথাও একটু আছে?"

নিরঞ্জনের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়া স্থরমা চলিয়া গেল। একদিক দিয়া অতুল শান্তিতে এবং আর একদিক হইতে একটা স্থতীব্র বেদনায় নরেশচন্দ্রের প্রাণটা যেন হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতদিন পরে স্থরমা যে তার জীবন-পথের সন্ধান ও সেই পথের আশ্রয় ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তারই এই আনন্দ!—আর তার সঙ্গেই—এই স্থদীর্ঘ কালের পর স্থরমার সকল সম্বন্ধ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার ব্যথা অত্যন্ত তীব্র হইয়াই বুকে বাজিল। কিন্তু তথাপি তাঁরা দুজনেই যে অতি বড় প্রলোভনকে জয় করিয়া অম্লান ও অপ্রতিহত রহিলেন, ইহার গৌরবও সেই ক্লিষ্ট চিত্তকে কম সান্ত্বনা দিল না। সঙ্গে সঙ্গে এ'ও ভাবিলেন, এই মহাসমরের একক নির্ভিক সেনাপতি কিন্তু স্থরমাই। সেই নিজের হৃদপিণ্ড স্বহস্তে উৎপাটিত করিয়াও তাঁহাকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে বাঁচাইয়াছে!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্য যদি না বর্জ্জন করে তোরে,
আমিও তোমায় করিব না বর্জ্জন।
—তীর্থরেণু

সেদিন নরেশ যখন চলিয়া গেলেন, পরিমলের বোধ হইল স্বামীকে যেন সে সেই মুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলিল। হয়ত চিরদিনের মতই তাদের এই ছাড়াছাড়ি। তাঁহাকে সে আর হয়ত কোনদিনই নিজের কাছে ফিরিয়া পাইবে না। স্বর্ণসূত্র খচিত গোলাপী আঁচল মুখে চাপিয়া ব্যথায় আকুল আচ্ছন্ন হইয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার উচ্ছ্বাসে কম্পিত বিদীর্ণপ্রায় অন্তরের মধ্য হইতে অভিমানপুষ্ট অভিযোগ ধারায় উৎসারিত হইতে লাগিল।—কান্নায় অধীর হইয়া মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "দুঃখীর চেয়েও দুঃখী আমি, মূর্খ আমি সে তো তুমি জেনে শুনেই আমায় ঘরে নিয়ে এসেছ! কিন্তু ভালবাসায় যে একসময়ে আমি আজকের রাজরাণীর চেয়েও অনেক বড় ছিলুম, সে তো তুমি দেখতে পাওনি? তাই ভেবেছ কতকগুলো সোনাদানা চাপিয়ে দিলেই গরীবের মেয়ের বুঝি বুক ভরিয়ে দেওয়া যায়। তাই,—না?—আমার বাবা আমায় কি আদর করতেন। আমার কি স্নেহ ভরা মস্ত লোক ভাই-ই ছিল! আমার মা!—আর তিনি?—তাঁর কাছেই কি আমি কম পেয়েছিলুম? দাদার বন্ধু কিন্তু দাদার চাইতেও যেন তাঁর যত্ন আরও বেশী ছিল। তাঁর মায়ের কথা মনে হ'লে যে এখনও আমি কান্না চাপতে পারিনি। আমায় তুমি গরীব বলে, কালো বলে, এত তুচ্ছ ভাববে যদি, তা'হলে কেন আমায় রাণী করতে নিয়ে এলে? আমি না হয় সেখানে পড়ে থেকে মরেই যেতুম। আমার

মতন পোড়াকপালীর মরণই ভাল ছিল যে! আজ যদি আমি আবার তোমায় হারাই, তা'হলে বেঁচে থেকে আমার হবে কি?

আবার—সে আবার বর্ত্তমান আঘাতের ও বিরুদ্ধবেদনায় ভরা অতীত স্মৃতির স্মরণে অজস্র কান্নায় ফাটিয়া পড়িল—কিন্তু তার পর সহসা তার মনে পড়িল এতক্ষণ হয়ত তার স্বামী তাঁর ভালবাসার-জনকে পাশে লইয়া তাকে একা ফেলিয়া কোথায়—কত দূরেই না চলিয়া যাইতেছেন! নিজের দুর্ভাগ্যপূর্ণ এবং স্বজনত্যক্ত অতীত আবার যেন তার ভয়াবহ মূর্ত্তি লইয়া চকিতে উঁকি মারিয়া গেল! অমনই সেই প্রচণ্ড অভিমান আতঙ্কের বন্যাধারায় দ্রুত ভাসাইয়া দিয়া সহসা সে বিদ্যুৎবেগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বারান্দায় ছুটিয়া আসিল। কিন্তু দেখিল, সেখানে মোটর প্রভৃতি বাড়ীর কোন গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছে না, খিড়কীর সাম্‌নে শুধু একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী মাত্র একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। পরিমল ইহা দেখিয়া ঈষৎ আশ্বস্ত চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় তার চোখে পড়িল, একতালার বারান্দা নামিয়া সেই ভাড়া গাড়ীর অভিমুখে একটী ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহাকে দেখিয়া সে সুরমা বলিয়া মনেও করে নাই, কিন্তু যখন তাহারই পশ্চাত পশ্চাত আসিয়া নিরঞ্জনও সেই গাড়ীতে উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তে নরেশ আসিলেন এবং নিরঞ্জনের হাতে একটা চিঠির খাম দিয়া বলিলেন, "এই চিঠি দেখালেই তারা সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে! তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারবে জেনেই নিরঞ্জনকে আমি তোমায় দিলুম। দেখছি, ওর মত বন্ধু আমার কেউ নেই।"—তখন সেই নিরাড়ম্বর বেশধারিণী ও বালিকাকৃতি মেয়েটীকে সুরমা জানিয়া পরিমল গভীর বিস্ময়ে যেন তলাইয়া গেল। সবিস্ময়ে মনে হইল, এত যে শুনেছিলুম, তা' রূপই বা ওর এমন অসাধারণটা কি?

কুৎসা রটনা যে কত অবাস্তব হইতে পারে, তাই দেখিয়া সে অবাক হইল। সে যে এতদিন শুনিয়াছে, রাজা তাঁর অর্দ্ধেক রাজ-ঐশ্বর্য্য সুরমার চরণে ঢালিয়া দিয়াছেন। হীরায় তার গা ভর্ত্তি এবং রূপ নাকি তার সেই হীরার চেয়েও উজ্জ্বল! তার যায়গায় এই সিদাসিদে একেবারেই নিরালঙ্কারা সুরমাকে তার বড়ই অস্বাভাবিক ঠেকিল। স্বামীর দুঃখিত কণ্ঠ ও অভিমান বাক্যও পরিমলের ঈর্ষা অন্তরে লজ্জার সূচী বিঁধাইয়া দিতে ছাড়িল না। স্বামীর প্রতি এতদিন ধরিয়া সে যে পরের মুখে ঝাল খাইয়া কত বড় অবিচার করিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাহার শীতল স্পর্শ এবং চাপা কান্না অনুভব করিয়া নরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

পরিমল ঝাঁপাইয়া তাঁর বুকের উপর পড়িয়া দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, অশ্রুপরিপ্লুত কাতর কণ্ঠে বলিল, "আমার উপর তুমি নির্দ্দয় হয়ো না। আমি যে সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি, আমারই বা তুমি ছাড়া এ সংসারে কে আছে? বল, আমায় পায়ে ঠেলবে না! বল, বল।"

নরেশ স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইলেন, তাঁর বুক ভরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। বলিলেন, "পরিমল! সুরমার কথা ভুলে যেতে পারবে?"

পরিমল মাথা হেলাইয়া জানাইল, পারিবে। লজ্জায় কথা কহিয়া উত্তর দিতে পারিল না।

"সে জন্মের মত আমার সংস্রব ছাড়িয়ে চলে গেছে, তোমার কল্পনা থেকে পার তো তাকে মুক্তি দিও। আমরা যেমন ছিলুম তাই থাকবো।"

নিরঞ্জন সুরমাকে লইয়া নরেশচন্দ্রের বাগানে যাইবার জন্যই বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ওই বাগানের রাস্তার ধারেই তো আমি আধমরা হয়ে পড়েছিলুম, রাজাবাহাদুর আমায় ওইখান থেকেই তো কৃপা করে তুলে নিয়ে আসেন। ঐ বাগানের দরওয়ানগুলো ঠিক যেন যমদূত!"

সুরমার একথা শুনিয়া কি মনে হইল, সে সহসা বলিয়া উঠিল, "দেখুন, বাবা! আমার সেই ছোট্ট বাড়ীটীতে অনেকগুলি দরকারী জিনিষ পত্র আছে, আজ আমরা সেই খানেই যাই চলুন। কাল তখন সব গোছগাছ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে একেবারেই।"

ভিতরের কথা না জানিয়া নিরঞ্জন সহজেই সম্মত হইল। যেখানে একদিন ভিখারী নিরঞ্জন নরেশের কৃপালাভ করিয়াছিল, সেখানের ভৃত্যবর্গ হয়ত মনিবের অসাক্ষাতে আজও তাকে তেমন করিয়া না মানিতে পারে। নরেশের পত্র থাকিলেও মানুষের প্রকৃতিকে কি হুকুমে রদ করা যায়? তাই সেখানে তার কিছু উপদ্রুত হওয়া অসম্ভব নহে জানিয়া নিজের বাড়ীতেই সে ফিরিতে চাহিল। নিরঞ্জন সঙ্গে থাকাতে মনে যথেষ্ট সাহস ছিল।

এখানে আসিয়াই কিন্তু অপ্রত্যাশিত ফললাভে আনন্দে সে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল!—এযে তার সেই ছোট্ট বেলাকার ইষ্ট-গুরু, সেই সাধুজী! আজিকার এতবড় দুর্দ্দিনে অযাচিতরূপে আসিয়া তারই প্রতীক্ষা করিতেছেন! অবর্ণনীয় আনন্দের আতিশয্যে শিশুর মত চঞ্চল ও উৎফুল্ল হইয়া চোখে জল ও মুখে হাসি লইয়া সুরমা বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুর গো! আপনি নিশ্চয়ই অন্তর্য্যামী! আমি যে কায়মনোবাক্যে আপনাকেই ডাকছিলুম, আপনি তা' টের পেলেন কেমন করে?"

উঁওার বা চাকর বাকর কেউ সাক্ষী ছিল না। কোথায় কোথায় গেলুম, কবে যেন একবার ভাল হয়ে কোনখানে চাকরীও করি। শীতকালটা থাকি ভাল, আবার নাকি পাগলামী ঘাড়ে চাপে, তারা তাইতে তাড়িয়ে দেয়। এম্‌নি কি কি ঘটেছিল, ঠিক ঠিক মনে না থাকলেও একটু একটু স্মরণে আসে। শেষে যেখানে চাকরী করি তারাই আমায় পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয় বুঝি। তা সেখান থেকে বেরিয়ে অবধি আর পাগল হইনি, তবে নূতন ক'রে জ্বরে পড়ে এমন দশা হলো যে আর খেটে খাবার শক্তিটুকুও ছিল না। দু'চার দিন ভিক্ষে করে কিছু কিছু পেটে দিই, দু'চার দিন না খেয়েই কাটে, তার পর থেকে সকল কথাই বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এই যে রাজা আমায় আমার আগের জন্মের মতনই মান দিচ্ছেন, এর কি আমি একটুখানিও যোগ্য ?

"আচ্ছা তা'হলে মানুষের সব চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যটা কিসে ? সব হারানো, না জ্ঞান হারানো ? বোধ করি জ্ঞান হারানোর মতন পাপের ভোগ আর কিছুতেই নয়। সবই তো আমার এই জ্ঞানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই জ্ঞানই যদি না রইলো তা'হলে আমার "সব"কে যে আমি হারিয়েছি তাইবা আমি জানতে পারলুম কই ? দুঃখ জিনিষটা যে সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য তাও তো নয়। দুঃখকেও ভোগ কর্‌তে একটা সুখ আছে। আমার যে মা আমার ইহজন্মের আরাধ্যা দেবী ছিলেন, তাঁর বিয়োগ দুঃখকে যদি আমার মন নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে দেয়, তা'হলে আমার পুত্রজন্ম সার্থক হবে কোথা দিয়ে ? না না থাক্,—হে ভগবান ! আমার এই অসীম দুঃখের পর্ব্বত তুমি ভেঙ্গে দিও না। যদি কেউ দুঃখের মধ্যে বিস্মৃতির কামনা করে, জেনো সে ভুক্তভোগী নয় বলেই তা করতে পেরেচে। আমার দুঃখ ! আমার ব্যথা ! আমার মনে তুমি পদ্মের মৃণাল হয়ে ওঠো, গোলাপের কাঁটা হয়ে থাকো—তোমায় যেন আর ভুলি না। কিন্তু এই

দুঃখকে বরণ করে নিতে আমি শিখলুম কোথা থেকে! বলো দেখি সেও একটি দুঃখী মেয়েরই কাছে। সে আমার ধর্ম্ম-মেয়ে হয়েছে, কিন্তু তাকে আমি মোটেই চিনিনে'। নাইবা চিনলুম? এ ভবের হাটে কেইবা কা'কে চিনেচে? যার সঙ্গে যখন মেলা যায় সেইটুকুই চেনাচিনি। গঙ্গার ধারে গাছ তলায় ভোরের পাখীর মতন সে একটি আনন্দের গান গাইছিল। দুঃখ থেকেও যে আনন্দের রস ছড়িয়ে পড়ে, আর তা আঁজলা ভরে পান করা যায়, তা' সেই দিনেই আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। নাঃ আর যা হই পাগল আর হবো না। এইটেই দেখেছি বিধাতার সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

"একটা জায়গায় আমার বড্ডই খটকা লাগে। সুখদার মুখ যেন এ বাড়ীর রাণীর মুখে কে' এনে বসিয়ে দিয়েছে। তাঁর গলার শব্দও যেন তারই থেকে চুরি করা! সে এতটা সুন্দর ছিল না, কিন্তু এত সুখ ঐশ্বর্য্যে থাকতে পারলে এইরকমই হতো হয়ত! এ' কেমন করে হলো? আচ্ছা সুখদা মরে গিয়েছে বলে যে আমার ধারণা হয়েছিল, সেটাই কি ঠিক?—কিসে জানলুম? কেউ কি আমায় বলেছিল? কিন্তু বলবেই বা আমায় কে? আমার পুরণো জগৎ থেকে কেউ তো আমার এই নূতন জগতে দেখা দিতে আসেনি তা'হলে সে কি শুধু আমার মনেরই কল্পনা? তা'হলে কি আমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্যে আমি এমন করেই অবহেলা করলুম? সুখদার তা'হলে কি হলো?" সে তো কম দিনও নয়, প্রায় চার বৎসর। এই চারটী দীর্ঘ বৎসর ধরে নিঃসহায়া সুখদাকে কে' দেখলে? খবর নোবো? কিন্তু কেমন করে? আমি যে মরে গেছি। মরা মানুষের চিঠি পেলে সে চিঠি জাল বলেই লোকে উড়িয়ে দেবে। তবে কি নিজেই যাব? বিশ্বাস করবে কেউ? আবার হয়তো মাঝে হ'তে পাগলা গারদে ভর্ত্তি হবো। বাড়ী ঘর টাকাকড়ি ছিল তো সবই—তা' কি সে সব তার থাকতে পেয়েছে, না

আমার খুড়তুতো জ্ঞাতিরাই সব দখল করলে ?—যদি জানতে পারতুম আমার সুখদা এই রাণী পরিমলের মতনই কোন দয়ালু স্বামীর হাতে পড়ে সুখে আছে, আমি বাঁচতুম যে তা'হলে। আমি যে তার ভাইয়ের হাত থেকে তার সম্পূর্ণ রক্ষা-ভার নিয়েছিলুম।

"——কাল সংবাদ পত্রে দেখলুম, যুদ্ধ জয়ের জন্য রাজনৈতিক অনেক অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হচ্চে! আহা আমার কালীপদ যদি আবার মুক্তি পেয়ে ফিরে আসে!—কিন্তু তাকেই বা সুখদার কথা আমি কি বলবো ?"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

তোমার সে আশায় হানিব বাজ,
জিজিব আজিকার রণে
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ!
হৃদয় দিব তারি সনে!

—কথা

নরেশ নিজের পাঠাগারে বসিয়া একখানা বই খুলিয়া সামনে রাখিয়াছেন, কিন্তু ভাবিতেছিলেন তিনি সুরমার কথা। সাধুজী ও নিরঞ্জনের সঙ্গে সুরমা অযোধ্যা যাইতেছে। সেখানে সাধুজী যে আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন তাহাই সুরমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থল; নরেশ অনেকখানি হাঁপ ছাড়িলেন। ঐ দু'জন লোককে তিনি একার্য্যের যথার্থ উপযুক্ত শুদ্ধচিত্ত বলিয়াই জানেন। মনে মনে তাঁদের কার্য্যের সফলতার কামনা করিলেন, মনে মনে সুরমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এজন্মটা তোমার এই রকম করেই কাটিয়ে নাও, এবার যেন নিরাপদ হও, শান্তি পাও।"

উহাদের আরব্ধ কর্ম্মের জন্য সাধুজী তাঁর নিকট চাঁদা চাহিয়াছেন। তিনি একখানা চেকবই টানিয়া লইয়া দশ হাজার টাকা সই করিলেন, টাকাটা সমিতির ধনভাণ্ডারে জমা দেওয়া হইবে।

পরিমল ঘরে ঢুকিয়া কথা কহিলে নরেশ চমকিয়া উঠিলেন, অশ্রু পরিপ্লুত এবং কি ভাঙ্গিয়া পড়া সে কণ্ঠস্বর!

"আমায় একবার সঙ্গে করে সুরমার বাড়ী তুমি নিয়ে যাবে? তার

সাধু কহিলেন, "বেটা! আমি যে তোমায় নিজের দরকারেই খুঁজতে এসেছিরে! রাজাবেটা যদি হুকুম দেয়, তা' হলে আমি তোকে আমার 'অশরণালয়ের' ভার দে'বার জন্যে সঙ্গে করে অযোধ্যাধামে নিয়ে যাই।—সেখানে দুতিন জন জমিদারের সাহায্যে আর ভিক্ষার ধন দিয়ে আমি এক মস্ত কাজের ছোট্ট একটী বীজ পুঁতেছি! জানিস বেটা! বদরীনারায়ণে গিয়েও তোর কথা আমার মনে জাগ্‌ছিল। পথে এক তোর মত পাঞ্জাবী মেয়ে হাতে পেলুম, তার মা বেটী আমার পা জড়িয়ে পাঁচ বছরের মেয়েকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালালো।—বল্লে; মেয়েটী যাতে ধর্ম্মপথ পায়। সেই থেকে বিস্তর ভেবে ভেবে তোদের কথাই আজ পাঁচ ছ বছর ধরে গেয়ে গেয়ে কিছু টাকার জোগাড় করলাম। এর মধ্যে আরও দু'তিনটী ছোট ছোট মেয়ে আমার কথা শুনে তাদের মায়েরা আমায় দিয়ে গেছে। পথের ধারে সদ্য জন্মানো একটাকে কুড়িয়েছি। দু'জন বুড়োমানুষের জিম্মায় তাদের রেখে তোকে এই নিতে এসেছি। কি হবে বেটা! গান বাজনা শিখে? হরিকে ডাকবার জন্যে নিজের স্বভাবদত্ত কণ্ঠ যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট! কাজ কর্; জগতে এসেছিস্, জন্ম সার্থক কর্! যে যেমন জন্ম পেয়েছিস বেটা, তাকেই বড় করে নেওয়া যায়। সবাই এ সংসারে আর একজনের বউ হবার জন্যেই জন্মায়নি। হাঁড়ি কুঁড়ি সাজিয়ে বর-কনে খেলা নাই বা করতে পেলি? ছেলে হয়ে 'মা' না বল্লেই কি তার মা হওয়া যায় না? যাদের দুঃখের জন্ম, লজ্জার জন্ম, জন্মেই যারা সব হারায়—এমন কি নিজের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত—তাদের মা হবে কি চিরদিনই ওই সাত সমুদ্র তের নদী পারের বিদেশী মায়েরাই? তোরা দখল করে নে' বেটা! দেশের ওই অনাদৃত অংশটাকে তোরা নিজের জোরে দখল কর্। ক'রে চরিত্রবলে সকলের দৃষ্টি এই দিকে টেনে আন্। এ একটা কম অভাব নেই ত তোর দেশের!"

ঠিক নিজেদের অন্তরের প্রতিধ্বনি এবং তাহা শুধু কল্পনা মাত্র নয়, বাস্তবের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাকে আহ্বান জানাইতেছে স্বরমা যে কি নিধিই হাতে পাইল সেকথা বলিবার নয়! পুনঃপুনঃ আনন্দাশ্রুসিক্ত হইতে হইতে বলিতে লাগিল, "উঃ যদি আমি আজ না আসতুম! যদি আমি আজ না আসতুম!"

সেই দুঃসহ ক্ষতির কল্পনামাত্রে স্বরমার প্রাণ যেন তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া গদ্‌গদ্ স্বরে কহিয়া উঠিল, "বাবা! এ শুধু তোমার পুণ্যে—তোমার পুণ্যে!"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভু! এলেম কোথায়!
বরষ গত হ'ল, জীবন বহে গেল,
কখন কি যে হ'ল জানিনে হায়!
আসিনু কোথা হ'তে, যেতেছি কোন্ পথে,
ভেসেছি কালস্রোতে তৃণের প্রায়।
মৃত্যুসিন্ধুপানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন,
জীবন অবহেলে, আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়।

নিরঞ্জন চলিয়া গেলে পরিমল তার জন্য যে এতখানি শূন্যতা বোধ করিবে, তা বোধ করি স্বপ্নেও তার জানা ছিল না। ইদানীং পড়ার দায় না থাকায় সে বেশ প্রসন্নচিত্তেই যখন তখন খুঁজিয়া পাতিয়া তার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করিতে আসিত। সেই অবসরে তার ঘরের বিছানার আহারের ও পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান করাও তার একটা কাজের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল। এই অপ্রিয়দর্শন ভগ্ন দেহমন লোকটীর মধ্যে পরিমল যেন তার পূর্ব্ব স্মৃতির একটুখানি সৌরভ পাইত, তাই তার পক্ষে তাহার পূর্ব্ব বিরাগ দিনে দিনেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সুরমা আসিয়া তাহাকে চিলের মতন ছোঁ মারিয়া লইয়া যাওয়াতে, হয়ত সে তার উপর বেশী করিয়াই চটিত, যদি না এর মধ্যে জড়িত থাকিতেন তারই স্বামী। নিঃসঙ্গ পরিমলের অবসর ক্ষেপের একটুখানি অবলম্বন নিরঞ্জনকে যে স্বামীর পরিবর্ত্তে টানিয়া লইয়াই তাঁর ঘাড়ের সুরমারূপী

প্রেতিনীটা বিদায় হইয়াছে, এই কথা মনে করিয়া নিরঞ্জনকে তার অতিবড় শ্রদ্ধা জন্মিল। হাজার বার করিয়াই মনে হইল, কথায় বলে,—'যাকে রাখো, সেই রাখে'—সে ঠিকই!—ভাগ্যে উনি ওটাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন, তাই না আজ নিজে বেঁচে গেলেন।—অন্ততঃ আমি তো বাঁচলুমই! ও না থাকলে আর কার ঘাড়ে যেত, আমার ঘাড়ই সে শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গতো।

যে সময়টায় সে নরেশচন্দ্রের খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য নীচে নামে এবং কোন কোন দিন একবার করিয়া নিরঞ্জনেরও খোঁজ খবরটা নেয়, তেম্‌নি সময় সেদিন নিরঞ্জনের বিজন কক্ষে প্রবেশ করিতেই দৃষ্টি পড়িল, একখানা মলাট ছেঁড়া পুরাতন খাতার উপর এই খাতার প্রথম পৃষ্ঠার ছত্র কয়েক মাত্র সে এক সময়ে পড়িয়াছিল, যখন সবে মাত্র আরম্ভ। এতদিনে না জানি মাষ্টার মশাই-এর ডায়রি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই খবরটী জানার অদম্য কৌতূহলে পরিমল সেই পরিত্যক্ত খাতাখানা তুলিয়া লইল। মাষ্টারমশাই তো এবাড়ীতে আর ফিরিবেন মনে হয় না। নিশ্চয়ই এইবার সে এই ছদ্মবেশীকে আবিষ্কার করিল! তবে এই যে ডায়রি এ সত্য সত্যই কি ডায়রি—অথবা ডায়রি-চ্ছলে লেখা একটা উপন্যাস নয় তো? এমন তো অনেকেই লেখে। নরেশের বিশ্বাস নিরঞ্জন একটা ছদ্মবেশী মহাজন! কিন্তু পরিমলের মনে নিরঞ্জন সম্বন্ধে খুবই যে একটা প্রকাণ্ড ধারণা জন্মিয়াছে, তা' কিছু নয়। তার বিশ্বাস সে একটু লেখাপড়া জানে, বসন্তে স্বাস্থ্য-হারা হইয়াছে, হয় গাঁজা খায়, না হয় আধ-পাগলা।—সে লোকটা আবার ডায়রি কিসের লিখিবে? কি এমন তার জীবন কথা? তবে গাঁজাখোর হইলে যে ঔপন্যাসিক হইতে নাই, তেমন কোন বিধান দেখা যায় না! অল্প বিদ্যা এবং সমস্ত অবসর লাভ বরং এ বিষয়ে সুযোগই দেয়। সে

তো ওর প্রচুর আছে। অনায়াসেই এই তাঁর পরিত্যক্ত খাতাখানা উপন্যাস হইতে পারে। হইলেই তো ভাল—তাদের মাসিক পত্রিকার খোরাক হইতে পারিবে। কি নামকরণ করিবে এর?—হারানো খাতা? মন্দ কি!

পরিমল এই খাতাখানার প্রথমার্দ্ধ শেষ করিয়া যখন বাকি অংশ পড়িতে আরম্ভ করিল, তার চোখে তখন নিরঞ্জনের তেমন সুন্দর ছাঁদের পরিষ্কার লেখাও যেন কতকগুলা অস্পষ্ট কালির আঁকের মতই হিজি-বিজি—যেন কতকগুলা পোকার ছানার মতনই কিলিবিলি করিয়া উঠিতেছিল। তার মাথার মধ্যে যেন একটা গুরু বেদনা, সর্ব্ব শরীরে যেন হাতুড়ি দিয়া পেরেক ঠোকার যন্ত্রনা;—চোখের দৃষ্টি কখনও ঝাপসা, কখনও, জ্বালাময়—আবার কখনও বা প্রবলবেগে প্রবাহিত অশ্রুর বন্যায় সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। তার অতীত জীবনের তিন-ভাগেরও বেশী তো দুঃখের মধ্য দিয়া অতীত হইয়াছে, কিন্তু বড় যন্ত্রণা-ভোগ যেন তার সে সব ভয়ানক দিনেও ঘটে নাই! একি অসম্ভবও সম্ভব হইয়া আজ তাকে দেখা দিল? একি সত্য?—একি স্বপ্ন নয়?—একি কোন যাদুকরের যাদু বিদ্যার ভেলকী—একেবারেই হইতে পারে না?—এ সম্ভব?—এও সম্ভব?—

সে খাতায় কি ছিল?—এমন কিছুই না! শুধু একটি দুর্ভাগ্য জীবনের দুঃখময় কাহিনী মাত্র। সংসারের খাতা হইতে ছিঁড়িয়া পড়া কয়েকখানি হারানো পাতা! সে পাতা ক'খানি এই রকম;—

"জীবনটা যেন এলোমেলো হয়ে পড়েছে! এর গ্রন্থি যেখানটায় ছিল, সে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।—বড় বেশী জট পাকিয়ে গেছে। লোকে আমার কথা জানতে চায়, তাদের কাছে বল্‌বো কি, আমার নিজের কাছেই সবটা যেন খাপ ছাড়া গোলমেলে ও অস্পষ্ট হয়ে

গিয়েছিল। মনেই কি ছাই ছিল কিছু? আমি যে কোন দেশের লোক, নামটাই বা কি ছিল, অক্ষর পরিচয় আমার কোন দিন হয়েছিল কিনা, এসবই তো বহু দিন ধরে ভুলে বসেছিলেম। মনে পড়লো কবে? তার বছর দেড়েক বাদে হবে বোধ করি? আচ্ছা ডাক্তার সাহেবের আশ্রয় আমি ছেড়ে আসি কোন্ সময়?—মনে পড়ে না। কিচ্ছু মনে পড়ে না। —হ্যাঁ, ভাব্‌তে ভাব্‌তে এই পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে যে, তাঁর ওখানে থাকতে থাকতেই আমি একটু একটু বই টই পড়তে পারছিলুম। এক দিন সাহেবের ছোট ছেলের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কইছি, তাই শুনে মেম-সাহেব সাহেবকে ডেকে আনেন। তাঁরা আমার ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করে কি একটা যেন বই দিলেন, গড় গড় করে পড়ে গেলুম। ভারী খুসী! ছেলেমেয়েরা তো আমায় ঘিরে আনন্দে হাত ধরাধরি করে নাচতেই লেগে গেলো!

তারপর থেকে আমার ভারি খাতির। সাহেব তো তাঁরা নন, সিন্ধুদেশের লোক। চেহারায় আর পোষাকে আমার ওঁদের ইটালিয়ান বলে বোধ হয়েছিল, দুদিন পরে বুঝলুম আমার ভুল। আমার বুদ্ধির দশা ঐ রকমই যে হয়ে পড়েচে! কে বল্‌বে যে এই আমিই একদিন নাকি ডবল অনার নিয়ে বি এ, পাশ করেছিলুম সব্বার ওপোর হয়ে!

হায়রে—"ধন জন মান, পদ্মপত্রে জলের সমান" এযে দেখছি তারও চেয়ে বেশী!—বিদ্যে বুদ্ধি এগুলোতো ভিতরের জিনিষ, সে তো আর লুঠ করে নেওয়া যায় না—অথচ দেখা যাচ্ছে যে তাও যায়। আর দেহের রূপ? সে যে কেমন করেই একেবারে হুবাহুব একখানা পোড়া কাঠের মূর্ত্তি নিতে পারে, সে যেদিন প্রথম দেখি, ঐ সিবিল সার্জন মালখানী সাহেবের বাড়ীতেই তাঁর ছোট মেয়ে সীতার হাতের

কৌটায় বসান আয়না দিয়ে, সেদিনের কথা—এই তো দেখছি বেশ মনেই আছে!—সেকি যন্ত্রণাই মনের মধ্যে বোধ করেছিলেম! তারপরই বোধ করি আবার আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় ও সেই সময় পাগলামীর ঝোঁকে কেমন করে বেরিয়ে পড়ে পালিয়ে আসি। সেতো একটুও মনে নেই! তার জন্যে এখনও আমার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না। তবে মানুষ হয়ে যে জন্মেছে সে যদি মানুষের মধ্যের সকল দুর্ব্বলতারই উর্দ্ধে উঠ্‌তে পারে, তা' হলে তো আর কথাই থাকে না। সে তো তখন পুরুষোত্তম পদ পায়। আমি যদি সেই জিনিস হ'তে পারতাম, আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত। পারিনি, তাই এই দুর্দ্দশা। সেদিন যে আমিকে আমি চিনতুম, সে আমিকে আর দেখতে পেলুম না। সে আমার যে মৃত্যু হয়েছিল, সে আমার আত্মীয়েরা যে আমায় শ্মশান ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়ে গেছে, সে আমি যে আর বেঁচে নেই, শ্রাদ্ধাধিকারী নেই বলে শ্রাদ্ধ হয়ত হয়নি; কিন্তু তার নাম যে মরার হিসাবের সঙ্গে লেখা হয়ে গিয়েছে; এ জগতের সঙ্গে যে তার কাজ কারবার চুকে গিয়েছে, সেই সব কথাই ওই আয়নার মধ্যে থেকে এক নিমিষের ভিতরে এই নূতন দেখা আধপোড়া ভীষণ মুখখানা আমায় বলে দিলে—আর চেঁচিয়ে উঠে আমি মূর্চ্ছা গেলুম। আর ওকে দেখিনি—কোন দিনই দেখিনি। দেখলে হয়ত এখনও অজ্ঞান হ'য়ে যেতে পারি। কি জানি কেনই আমি ওকে সইতে পারিনে—একেবারেই সইতে পারিনে। যেন মনে হয় ঐ আমার সেই পুরানো অতীতকে—হারানো অতীতকে —আমার কাছ থেকে ডাকাতী করে কেড়ে নিয়েছে। এখন এ মুখ নিয়ে যদিই আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই, আমায় কি তারা তাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত রমেশ বলে আদর করে ডেকে নেয়? না পাগল বলে পুলিস ডাকে? এটা আমার জানতে ইচ্ছে করলেও এ পর্য্যন্ত পরখ

ভগবান, তা'তেই তো সেই সুখের পদ্মটীও অনর্থক উদ্ভূত কাঁটার উপর ফুটে থাকে। তারপর বিদ্যারম্ভ হলেই সুখের ঘরে শুন্তি বস্‌লো! ক, খ শেষ হতে না হতেই শট্‌কে নামতা—সঙ্গে সঙ্গে এ, বি, সি, ডি'র ঠ্যালা! তার পর অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল দেখা দিলেই তো মাথার ঠিক রাখাই গোল হয়ে পড়ে! তারপর এই মহাসমরে জয়ী হয়ে উঠ্‌তে পারলে—ভগবান করুন আমার মতন কারু আজন্মের সাধনা এমনি করে যেন ব্যর্থ না হয়;—কিন্তু সুখী হতেও যে আমি বড় একটা কাউকে দেখেছি, এ'ও তো কই মনে পড়ে না। হয়ত কোটীর মধ্যে দু'একজন—যাঁরা পরের জন্য নিজেকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিলিয়ে দিতে পারেন, তাঁরাই যথার্থ সুখী। অন্ততঃ হওয়া উচিত!—এদের মধ্যেও রাজা নরেশ কিন্তু মোটেই সুখী নন—এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। ওঁর হাসি খুসী মুখের, ওঁর মনের মধ্যে অশ্রুর একটা দুরন্ত নির্ঝর কিন্তু ঢাকা আছে।—কেন? সে আমি কি করে জানবো? ওঁকে দেখে যা' আমার মনে হয় সেইটুকুই শুধু আমি আমার এই ছেঁড়া খাতার পাতাটীতে লিখে রাখলুম!

"আচ্ছা রাণী পরিমলকুমারী—আমার যিনি ছাত্রী, তাঁকে আমার কি মনে হয়? তিনি সুখী না অসুখী? নাঃ, ওসব মেয়েরা খুব বেশী সুখী না হলেও অসুখীও প্রায় হতে পারে না।—মন ওদের ক্রুর নয়, নিষ্ঠুর নয়, খুব বেশী স্বার্থপর যে তাও নয়। অথচ এদের সাধারণের সঙ্গে বেশ একটা তফাৎ আছে!—সেটা কি—সে যিনি এদের তৈরি করেছেন, তিনিই জানেন।—এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়ত হেরেই যাবো। তবু একটা কিছু যে প্রভেদ আছে তা অনস্বীকার্য্য; তিনি রাজা নরেশ নন! এ জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষ ডোবেও না, ওঠেও না, ভাঙ্গেও না এবং নূতন করে কিছু একটা বড় জিনিষ গড়েও না! স্থিতিস্থাপক ভাবে এরা জীবনটাকে একরকম কাটিয়ে দিয়ে যায় ভালই

বলতে হবে। ঝড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখিবার এদের শক্ত ডানা আছে—কিন্তু সামান্য ঘা খাবার সাধ্য নেই, সেখানে লতার মত নেতিয়ে পড়ে।—এঁকে দেখলেই আমার সুখদাকে মনে পড়ে কেন? সর্ব্বান্তঃকরণেই আমি আশীর্ব্বাদ করি ভগবান ওঁকে রাজরাণী করেই যেন নিশ্চিন্ত থাকেন না, ওঁর সুখ যেন সুচিরস্থায়ী হয়।

"সুখদার কথা মনে হ'তে আবার অনেক কথাই মনে পড়ে গেল! সেই সব পুরানো গাওয়া গানের সুর বাতাসে ছড়িয়ে আছে, তারা যেন সুরবাহারের সুরের ঝঙ্কার উঠ্‌তেই আপনি এসে মনের তারে ধরা দিলে! সুখদার কথা আরও যে আমার বলবার আছে।—তাকে কোথা থেকে, আর কেমন করে পেলেম, সে কথা তো এখনও বলা হয়নি। আবার হারাতেও যে বেশী সময় লাগেনি, সে কাহিনীটুকুওতো বাকী রাখা চলবে না। আমার জীবন কথার সবখানিই মনের ভিতর একবার ভাল করে গুছিয়ে নিই। তারপর?—তারপর এ খাতাখানা আর একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে, সেই ভোরের আলো লাগা ঝিমিয়ে আসা তার চুম্বিত ঘুমন্ত গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসবো। চাই কি—সেই অবসরে আর একবার আমার সেই "আনন্দময়ী" মায়ের আমার হঠাৎ পাওয়া মেয়েটীর সঙ্গেও হঠাৎ গেলেও দেখা হয়ে যেতে পারে। সে' কে আমি জানি না, জানতেও চাই না, শুধু তার মধ্যে যে মস্ত বড় একটা সম্ভাবনা জেগে উঠ্‌ছে, সে যেন আমার অন্তর্য্যামী সেই দিনের সেই শুভ মুহূর্ত্তে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন। সেই থেকেই আমার এই মরা-মন জ্যান্ত হয়ে উঠে অনুক্ষণ প্রাণের তারে গুঞ্জন করে বলছে;—

"বিপদ সম্পদের তরে; দিতে পরম পদ তারে;—"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রোগ মসীঢালা কালীতনু তার,
লয়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে,—করি
পরিহার, বিষাক্ত তার সঙ্গ।

—কথা

কালীপদর বাড়ী যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যার বড় বেশী দেরি নেই। ওযে অত গরীব ছিল তা' আমি কোন দিন জানতে পারিনি! সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙ্গে বোধ করি কোথায় চলে গেছে, আর একখানা বাতাসে ঢক্ ঢক্ শব্দ করচে। বাড়ীখানা এক সময়ে যে গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বড় লোকেরই বাড়ী ছিল, সে আজও তার বপুখানা দেখেই বোঝা যায়। হ'লে হবে কি, আজ যে তার এ গাঁয়ে সবার চাইতে দশা মন্দ, সেও তো একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেলেম।

"উঠানে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিয়ে একটী কিশোরী মেয়ে তার ময়লা কাপড়ের আঁচলটুকু গলায় জড়িয়ে প্রণাম করছিল, আমায় দেখতে পেয়ে সেই আঁচল সে গায়ে টেনে দিলে, মুখের চেহারা থেকেই জান্তে পারলুম যে সে আমার কালীপদর বোন সুখদা, যাকে তার ভাই স্বদেশী মন্ত্রের সাধকতার 'তীর্থ-যাত্রার মুখে আমার উদ্দেশ্যে সম্প্রদান" করে গেছে!

"সুখদার মা যত পারলেন কাঁদলেন, জন্মের মতন দ্বীপান্তরিত ছেলের কথা উল্লেখ করে তার আচরণের তীব্র নিন্দা করলেন এবং যারা তাকে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে তার চেয়েও অধিকতর পাপে পাপী হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যেও তিনি খুবই খোলা মনে আশীর্ব্বাদ করতে পেরে

উঠলেন তাও নয়। তার পর অনেক বিলম্বে আর সব কথা চুকিয়ে দিয়ে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের কথা তুল্লেন।

"সংসার তো আর চলে না বাবা! যা' কিছু ছিল পদ'র মোকদ্দমায় সবইতো উকিলকে ধরে দিলাম। আইবুড় মেয়ে ঘাড়ে, কি যে আমি একে নিয়ে করি এখন!"

"আমি আগে হ'তেই ভাবছিলাম যে কেমন করে ওকথাটা আমি বলবো? অবশ্য 'পদ'র বোনকে চোখে দেখে বলবার ভাবনাটা আমার একটুখানি কমে গেছলো।—তার কারণ কুৎসিত না হলেও সুখদাকে দেখতে এতই সাধারণ যে, সে দেখেই যে আমি মাথা ঘুরে পড়িনি—এটা অন্ততঃ তার মা বিশ্বাস করতে পারবেন। এখন আরও একটু সুযোগ পেয়ে নিঃসঙ্কোচেই বলে ফেল্লুম, "তার জন্যে ভাববেন না। কালীপদ যাবার আগে তার ভার আমার হাতে দিয়ে গেছে, আমিও তার কাছ থেকে তা' সর্ব্বান্তঃকরণে সে ভার গ্রহণ করেছি।"

"পদ'র মা কেমন যেন একটু সন্দেহের সঙ্গে আমার মাথা হ'তে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কথা কইলেন—বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবেই বল্লেন, "তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে? এতগুলো পাশ করেছ, অত সুন্দর তুমি, পদ'র মুখে শুনেছিলাম, তোমার বাপ ছিলেন জেলার হাকিম। তুমি কি আমার মতন দুঃখীর মেয়েকে—"

"নিজের ভাল ভাল সার্টিফিকেটগুলি শুনতে শুনতে বেশ কৌতুক বোধ হচ্ছিল, হাসিও পেল, আমি হাসি চেপে রেখে জবাব দিলুম—'পদ' আমায় যে তার ভার দিয়ে গেছে।—বিয়ে যার সঙ্গে হয় হবে, সেতো আর এক্ষুণি হচ্চে না, তবে ভাল পাত্র আর কোথাও যদি নেহাৎ না পান, তো আমাকেই তখন দিয়ে দেবেন। আমার আপত্তি হবে না।"

"তার পর সুখদা তার মায়ের আদেশ মত আমার জন্যে জলখাবার

নিয়ে এলো। আমি খাচ্ছি, পদ'র মা পুনশ্চ সংশয়িত ভাবে কথা পাড়লেন, "মেয়ে তো আমার সুন্দরী নয়—কালীপদর মতন, তাই আমার আর আপত্তি নেই।"

আমি বাধা দিয়া সাগ্রহে বলে উঠলেম, "ওকে দেখতে যে পদ'র মত সেই তো ওর রূপ।"

"সুখদার মা এবার যে কান্নাটা কাঁদলেন তার মধ্যে আধখানা দুঃখের এবং আধখানা সুখের। সেই ছেলেই তো তাঁকে 'মহাদেবের মতন' জামাই দিয়ে গিয়েছে!—এই কথাটা এ ক্রন্দনের মধ্যের প্রধানতম বিষয় হয়ে রৈলো।

"মাস কতক পরে পড়াশোনা সাঙ্গ করে ঘরে এসে বসলুম।"

"ওইখানকারই সবজজের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বছর পার হয় চলে আসছিল। মেয়ে আমি দেখেছি, চারুমতীকে দেখতে বোধ হয় ভালই হবে। যা' একটু মোটা। তা' ধনীর দুলালীরা ওরকম একটু হবেন বই কি! গণে, পণে, অলঙ্কারে, বস্ত্রে এবং আসবাবপত্রে জজবাবু হাজার সাতেক টাকা মেয়ের প্রতি খরচ করবেন একথাও নাকি ধার্য্য হয়ে গিয়েছিল। আমি বাড়ী এসে বসতেই তিনি লোক দিয়ে পাকা দেখার দিন ঠিক করে বলে পাঠালেন।

"মা খুবই খুসী—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হরিষে বিষাদ ঘটলো। মাকে সুখদার কথা ভেঙ্গে বলে জানালুম যে, এ বিয়ে করা আমার আর চলে না।—তাদের আমি কথা দিয়েছি। মার মনে যে বড় বেশী আঘাত লাগলো, সে আমি খুবই বুঝেছিলেম। মা যে আমার এই একই সন্তানের জননী। কুটুম্বিতার সাধ আহ্লাদ নারীজন্মের নাকি ঈপ্সিত! যাই হোক তবু আমার কথা বজায় রাখবার জন্যে তাঁর ধনী কুটুম্বের সাধ তিনি ছেড়েই দিলেন।

জজবাবু নিজে এসে আমায় ডেকে বল্লেন, 'জানো তুমি—তোমার মার নামে আমি 'ব্রিচ অফ্ কণ্ট্রাক্টের কেস' করতে পারি।'

"তা' অবশ্য আমি জানতাম না। আর যতই কিছু পড়িনা কেন, আইন তো পড়িনি, জানবো কেমন করে? একটু ভেকা হয়ে রইলুম। তিনি তখন আমায় কাবু দেখে অনেক কথাই বল্লেন এবং তক্ষুণি গালি ফিরিয়ে নিয়ে আমায় 'আশীর্ব্বাদ' করে যেতেও রাজী আছেন, তাও জানিয়ে দিতে দেরী করলেন না। ততক্ষণে আমার জড়তা কাটলো, আমি বল্লেম, 'আমি আর একজনকে কথা দিয়েছি যে, তারা গরীব অনন্যোপায়, তাদের বঞ্চনা করলে ঈশ্বরের দরবারে আমি অপরাধী হবো।—আপনার ভাবনা কিসের!"

কথাটা খোসামোদেরই ছাঁচে ঢালা। তা'তেই হয়ত বা বাবুটীর রাগ বাড়লেও মাত্রাটা কিছু কম থাকলো। তিনি রুষ্ট পরিহাসে রূঢ় প্রশ্ন করিলেন, "তিনি কার কন্যে শুনি?"

আমি বিনীত বচনে জবাব দিলাম, "তার বাপ ছিলেন কালেক্টরীর সেরেস্তাদার। একমাত্র ভাইএর রাজদ্রোহের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে, বুড়ী মা ছাড়া আর কেউ নেই।"

জজবাবু যেন আঁৎকে উঠেই উঠে দাঁড়ালেন। রাজদ্রোহের নামেই বোধ করি তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়ে থাকবে। এবার স্পষ্ট পরিহাসেই বললেন, "তাহলে কুটুম্ব নির্ব্বাচনটা করেছ ভাল। যাহোক সময় থাকতে খবরটা পেয়ে ভালই হলো, এনাকিষ্টের দলে মেয়ে দিয়ে কি শেষে ধনে প্রাণে মারা যেতাম!"

মার অনুমতি নিয়ে কালীপদর মা বোনকে মার আশ্রয়ে এনে দিলাম। ভাবী পুত্রবধূর মুখ দেখে মা যে আমার খুব উল্লসিত হয়ে উঠেননি, সেতো আমি বুঝতেই পেরেছিলুম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের

মাতাপুত্রে কোন আলোচনাই আমরা হ'তে দিইনি। মন তার কল্পনার স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চাইবে বই কি! নিজের ছেলের মস্ত নামওলা শ্বশুর, আর সুন্দরী বউ কোন্ মা কবে চায়নি? অথচ কর্ত্তব্যের খাতিরে কত কিই না করতে হয়। ক'জনের মাই বা ভরা বুকে বউ ঘরে তুলতে পেরেছেন? সয়ে যাওয়া দরকার—চুপ করে সবই সয়ে যাওয়া—যা পায় তাকেই যথাসাধ্য ভাল মনে করা—এইটুকুই যে জগতে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। ঐটুকু না পারলেই যে মানুষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

সুখদারা রয়ে গেল, আমি চাকরীর জন্য খোঁজ খবর করে বেড়াচ্ছি, আরও দুটো একটা পাশ টাস দেবারও ইচ্ছে আছে। বিয়ের জন্য সুখদার মা ছাড়া আর কারু যে বিশেষ কোন ত্বরা আছে তার কোন লক্ষণই দেখিনে'। আমার? হ্যাঁ—তা' আমার যে একেবারেই ছিলনা, তা'ও বলতে পারিনে। আবার ছিলই যে তাও বলবার ভরসা নেই। বিয়ে জিনিষটা সম্বন্ধে খুব বেশী তলিয়ে আমি কোন দিনই ভাবিনি। গোটা কয়েক পাশ করার সঙ্গে ও'ও যেন একটা দায় চোকান। কিন্তু সুখদাকে মোটমাট আমার ভালই লাগছিল। ভালবাসা একে বলতে হয় তোমরা বলতে পারো। আর তো কখন ভালবাসিনি, কাজেই ও নিয়ে তর্ক আমি করতে পারবো না—তবে ভালবাসার বর্ণনা যেখানে যত পড়েছি, তাদের সঙ্গে এ ভালবাসার সম্পর্কটা খুব বেশী বলিয়া বসন্ত মলয় কোকিল কুজনের সঙ্গ ছাড়া হয়ে সুখদা থাকে মার অন্তঃপুরে আর আমি থাকি হয় সদর বাড়ীতে, না কলকাতায়। বাড়ীর মধ্যে গেলে কখন কখন সুখদাকে এক আধবার দেখতে পাই। একটু গম্ভীর গম্ভীর চালে সে হয়ত মায়েদের দুজনের পূজোর যোগাড় করছে, না হয়ত পান সাজবার সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে, মধ্যে মধ্যে পড়াতে বসে মা তাকে

'বোকামেয়ে' বলে অনুযোগ করছেন, তা' শুনতে পেয়ে হাসি চেপে আমি বাইরে পালিয়ে এসে হেসে ফেলেছি। আহা, মা আমার ওপর যা খুসী হচ্চেন। যখন তখন বলেন, 'গাধা পিটে ঘোড়া বানানো' মুখের কথাটাতো নয়। মা আমার সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিতা। সুখদার মেধা জিনিষটা বড্ডই নাকি কম! অন্ততঃ মার ত সেই রকমই অভিমত। তা হোক, কি হবে কতকটা বই পড়া বিদ্যা নিয়ে! ও যে আমার পদ'র বোন, যে পদ দেশের মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে আজ সুদূর নির্ব্বান্ধব আন্দামানে দুর্ব্বহ জীবন বহন করছে। আমি কি তাকে ভুলতেম—"

বেশী দিন গেল না। বাবার চাকরী, তাঁর অসময়ে মৃত্যুর সুপারিসে আমি নাকি পেতে পারতুম, কিন্তু ইচ্ছা হলোনা সেটাকে কাজে লাগাতে। কালীপদ আন্দামানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দড়ি পাকাচ্চে, আর আমি করবো সেই সরকারের গোলামী! সেই জজবাবু নাকি আমার সম্বন্ধে সরকারের কান ভারী করেই রেখেছেন এম্নি একটা গুজবও শোনা গেল। সে ভালই হলো আমার পক্ষে। আমি নিজের টাকা দিয়ে একটা আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধের দোকান খুলে বস্‌লেম। দেশে এক বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন—মকরধ্বজে সুরকির গুঁড়ো মেশাতে না জানায়, তাঁর কিছুমাত্র পশার ছিল না। তাঁকে দিয়ে খাঁটি মকরধ্বজ তৈরি শিখে নেবার চেষ্টায় লেগে পড়া গেল। তাঁকে সহায় করে কস্তুরী ভৈরব বা মহামৃত্যুঞ্জয় রসে কস্তুরীর বদলে আদা বাটা বন্ধ করে দেশের লোক যাতে খাঁটি জিনিষ পায় আর বিলিতি ওষুধের মতন নিঃসঙ্কোচে মারাত্মক রোগীকে খাওয়াতে পারে, তারই জন্যে উঠে পড়ে লাগবো মনে করেছিলেম। তা কপালে এইটুকু ভাল কাজ করবার পুণ্যও যে সঞ্চিত ছিলনা, ও হবে কি করে?

"আমার কবিরাজখানার সত্যকার মুক্তাভস্ম, স্বর্ণভস্ম—করাতের

গুঁড়ো নয়—নিখুঁত নেপালী কস্তুরী এবং যত রকম গাছ গাছড়া পাওয়া সম্ভব ছিল, ক্রমে ক্রমে জোগাড় করে তুলছি, এমন সময় এমন মারাত্মক রূপে আমাদের দেশে বসন্ত-মড়ক দেখা দিল যে তাঁর কাছে আসল নকল সব রকমের কস্তুরী ভৈরব বা মৃত্যুঞ্জয় রস ভয় পেয়ে পালিয়ে রইলো। হরিনাম সহজে তো কেউ নেয় না। তা' দিনের মধ্যে অমন পনের বারই হয়ত ঐ নাম কানে শোনা তো যেতই, মুখেও বলতে হয়েছে বই কি পাড়া পড়সীর খাতিরে! মা আমার জন্যে ভয় করলেও নিজে নির্ভয়ে পড়সীর বাড়ী বাড়ী সেবায় ছুটে যেতেন। আমায় এঁটে উঠতে না পেরে কপাল চাপড়ে খুন হতেন, কিন্তু তবু জোর ক'রে বারণ করতেন না। কেঁদে বলতেন, 'ও নিজের কাজ করে রাখচে, বারণ আমি করবো কি করে? বিপদতারণ আছেন, তাঁকেই প্রাণপণে ডাকচি!'

"প্রথমে এ বাড়ীতে বসন্তের ছোঁয়াচ লাগলো সুখদার মাকে দিয়ে, তাঁর সেবা আমরা তিন জনেই করছিলুম, কিন্তু দুজনেই আমরা একদিনের আড়া-আড়িতে দুজনকারই মাকে হারিয়ে ফেল্লেম। সুখদা মেয়েমানুষ, সে লুটোলুটি করে তার হারানো জিনিষের জন্য চেঁচিয়ে কেঁদে শোক প্রকাশ করলে, কিন্তু বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি বলে আমার অত বড় ক্ষতি আমায় শুধু নিঃশব্দ চোখের জল দিয়েই সাঙ্গ করে নিতে হলো! তার উপর যে মুখের চেয়ে জগতে আমার আর কিছুই সুন্দর ও প্রিয় ছিল না, সেই সব চেয়ে আদরের মুখই আমার নিজের হাতে—ভাবতে গেলে সমস্ত মন যেন ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে ওঠে—পেরেছিলুমও তো!

সুখদার জন্যেই ভাবছিলুম, বাড়ী ছেড়ে দুজনে কোথাও পালাব নাকি? এমন সময় আমার পালাবার শক্তি হরণ করে আমার সর্ব্বশরীর ব্যেপে বসন্তর গুটি দেখা দিল। সে কি যন্ত্রণা! উঃ সে কি যন্ত্রণা! বোধ করি শরশয্যা পেতে শুলেও তেমন করে সর্ব্বশরীরে তার ফলাগুলো

বেঁধে না! হাজার হাজার ছুঁচ দিয়ে যদি সর্ব্বশরীরের মাংসের মধ্যে ফোঁড় তোলা যায় তাতেও কি অত বেশী যন্ত্রণা দিতে পারে? উপকথার রাজার যেমন চোকে শুদ্ধ ছুঁচ বেঁধা ছিল, আমার চোখেও যেন তাই হলো। বিশেষ করে ডান চোকটায়। রোগের খেয়ালে যন্ত্রণার আর্ত্তনাদে কেবলই মরা মাকে আকুল হয়ে ডেকেছি, আর সঙ্গে সঙ্গেই কার অশ্রু-জলে ভেজা কাতর স্বর কানে গেছে, 'মা! মা! মা শেতলা! ভাল করে দাও মা! মা! মা! মা! ভাল করে দাও মা!'

"যতক্ষণ জ্ঞান ছিল সুখদাকেই অনুভব করেছিলুম, দেখবার তো চোখ ছিল না। মধ্যে মধ্যে তাকে মিনতি করে বলেও ছিলুম, 'পালিয়ে যাও সুখদা! কেন অনর্থক প্রাণ দেবে, আমি তো গিয়েইছি।'

"সে কেঁদে উঠে বলেছিল, 'এক সঙ্গেই যাই চলো, একলা আমি দাঁড়াবো কোথায়?'

"এই প্রথম আর শেষ কথা আমাকে সে বলেছিল। এর পরের কোন কথাই আমার আর মনে নেই। আমার যখন জ্ঞান হলো তখন আমার সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে, তাই মনে নেই কত দিনে কত অল্পে অল্পে আমি আমার সেই মরণ শয্যা থেকে বেঁচে উঠেছিলুম!

"হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারদের কাছে পরে শুনেছি, ডাক্তার যে দিন বজরা করে আস্‌তে আস্‌তে জলন্ত চিতা থেকে আমায় মাটিতে আছড়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে আমায় জীয়ন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন, তার পর থেকে প্রায় ছয় মাস পরে আমার গায়ের ঘা শুকিয়ে আমার বাঁচবার আশা দেখা দেয়। এতকাল ধরে হাস-পাতালের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পড়ে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছি। প্রাণ জিনিসটা তো বড় কম কঠিন নয়! আচ্ছা, এই যে আমি মরে গিয়েও বেঁচে উঠলুম, এর পর থেকে কি আমার পুনর্জন্ম হলো না?

আমি কি আর সেই আগের আমিই আছি? মরে যে গিয়েছিলুম, তা'ত বুঝতেই পারা যাচ্চে! পোড়াতে যারা এসেছিল, তারা আমার নিকট বন্ধু কেউ যে নয়, তা চিতায় তুলে দিয়ে প্রস্থান করায় প্রমাণও হচ্ছে। কিন্তু কি ভয়ানক আয়ুর জোর আমার! আর অমন নির্জ্জন 'শ্মশান' ঘাটেও কিনা অত বড় 'বান্ধব'ও জুটে গেল! সেই গলা পচা বসন্তের রোগী তুলে, একবেলার পথ বয়ে এনে এই যে ছ মাস ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচালেন, এ কি বড় সোজা কথা! আমার প্রাণটাকে যদি একটুও মায়া করবার দরকার থাকতো, তা'হলে তাঁকে আমার রোজ সকালে উঠে ফুল চন্দনে পূজা করাই উচিত ছিল। কিন্তু তা' না থাকলেও তাঁর দয়ার যে শেষ হয় না, তা আমায় পুনঃপুনঃ স্বীকার তো করতেই হবে। তাঁর পায়ের তলায় পড়েই এই নূতন জন্মটাকে আমার ক্ষয় করে যাওয়াই উচিত ছিল বই কি! কিন্তু তখন কি আর মাথার কোন ঠিক আছে? কে আমি, কি করচি, কোথায় যাব—সবই যে ভুল হয়ে গেছলো। ছ মাসের পর প্রাণের আশা! তারও পর পাঁচ ছ মাস প্রায় পাগলামীর বিকারে কেটে যাবে!—ভাল করে উঠতে বাঁচতে পেরেছি নাকি সেও ন'মাস দশমাস পরে। সবশুদ্ধ বৎসর দেড়েক আপনা ভোলা হয়ে ছিলুম। অর্থাৎ জীবধর্ম্ম ছাড়া মানুষের ধর্ম্ম বড় কিছুই আমার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল না। তবে নিরুপদ্রব বলে পাগলা গারদে না পাঠিয়ে আমায় প্রাণদাতা-পিতা আমায় নিজের হাসপাতালেরই একপ্রান্তে ঠাঁই দিয়েছিলেন। কিন্তু কপালে যে বিস্তর বিড়ম্বনা লেখা আছে তার হবে কি—মনুষ্যত্ব ফিরে আসতে না আসতেই এই মুখের ছবি আমায় পাগল করে এবার পথেই ঠেলে বার করে দিলে!

"তার পরের কথা আরও যেন থৈহারা, খাপছাড়া। আসল কথা এই যে, তখন তো আর আমার কথা বলবার জন্ত ডাক্তার সাহেবের কৃপা-

কাছেও ক্ষমা চাইবো,—আর—আর—যাঁকে—যাঁকে না চিনে—না জেনে—"

"পরিমল! কি বল্‌চো তুমি! তুমি সুরমার বাড়ী যাবে তার কাছে ক্ষমা চাইতে?"

পরিমল রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিবার অশেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, "হ্যাঁ যাবো। কিন্তু শুধু তার কাছেই তো নয়; তার চেয়েও ঢের বেশী অপরাধী আমি যাঁর কাছে, তাঁর পায়ের ধূলো না নিয়ে এলে আমি যে আর স্থির হ'তে পারছিনে! ওগো, আমায় নিয়ে চলো যাই—পরিমল সহসা ফুকারিয়া শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশ চৌকি হইতে সবেগে উঠিয়া পড়িলেন, "পরিমল! পরিমল! কার কথা তুমি বল্‌চো? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনে! কার কাছে ক্ষমা চাইবে? কার কাছে তুমি অপরাধী?"

ক্রন্দনবিবশা পরিমল একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তুমি কি করে বুঝ্‌তে পারবে? তুমি তো চেনো না।—কিন্তু আমি, আমি কি করে তাঁকে অত অযত্ন করেছিলেম! আমি কি করে তাঁকে চিন্‌তে পেরেও চিন্‌তে পারিনি? গরীব নিরঞ্জন বলেই না অমন করে তুচ্ছ করতে পেরেছিলেম। তিনি যে আমারই মায়ের আনা রোগ ঘেঁটে নিজে রোগে পড়েছিলেন, তাঁকে যে মরা মানুষ মনে করে আমিই দাহ করতে নিয়ে যেতে দিয়েছি। ওগো! আমি কি! আমি কি! আমি কি মানুষ!"

হাবড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে পা দিয়াই নরেশের সঙ্গে সাধুজীর দলের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। সাধু সানন্দে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "এই যে রাজা বাহাদুর আমাদের তুলে দিতে এসেছেন।—জয়োস্তু!"

সাধুজীর সঙ্গে স্বাগত শেষ করিয়া নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর

হইল নিরঞ্জনের দিকে। নিরঞ্জন এত লোকের মধ্যে তার মতন একটা নগণ্যের এতটা খাতির অশোভন হয় দেখিয়া নত হইয়া নরেশের পদধূলি লইতে গেলে নরেশ তাহাকে উত্তপ্ত গাঢ় আলিঙ্গনে বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিলেন, কৃত্রিম কোপে হাসিয়া ধমক দিলেন, বলিলেন, "ফের তোমার বদ্‌মাইসির ফন্দি!"

তার পর ইঁহারা ষ্টেশনের একপ্রান্তে একটু ভিড় ছাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, নরেশ বলিলেন, "নিরঞ্জন! মুক্তেশ্বর রায়ের নায়েব হরিশচন্দ্র মিত্র যে মহাপাতক করেছিলেন, তাঁর সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা-লব্ধ সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা—অর্থাৎ যে অংশটা তিনি মুনিবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সেটা আমি বিষয়ের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে এনেছি। না—কোন কথা শুনবো না নিতেই হবে তোমাকে। তোমার বাবা রত্নেশ্বরবাবু সেই সূর্য্যাস্ত নিলামেই সেই সম্পত্তি হাতে পেয়েও একদিন আমার বাবাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি যে চিঠিখানি লেখেন, সে চিঠি আমি আজও সযত্নে তুলে রেখেছি, তোমার হাতের লেখা ঠিক চিঠির লেখার মতন! তাই তোমার করা কপি দেখে আমি চম্‌কে উঠেছিলুম। যাহোক চার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সেই চিঠি পেয়েই আমি তোমার খোঁজে চট্টগ্রাম গিয়ে জানতে পারি, মাত্র মাস কয়েক আগে তুমি ও তোমার মা দুজনেই মারা গেছ।—তখন আর কোন পথ না পেয়ে —যদিই এতে আমাদের পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হয় সেই ভেবে তোমারই শেষ চিহ্ন বলে তোমারই পরিত্যক্তা বাগদত্তা মেয়ে সুখদাকে আমি—"

নিরঞ্জনের পা টলিয়া সে বসিয়া পড়িতেছিল, নরেশ তাকে হাতে ধরিয়া নিকটস্থ বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিলেন। গৈরিকধারিণী সুখদা দূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্ত্তা সবিস্ময়ে শুনিতেছিল।

শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হইতে গিয়া সে সাশ্চর্য্যে দেখিল, নিকটস্থ মেয়েদের বিশ্রামাগার হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিয়া একটী প্রায় তাহারই সমবয়সী মেয়ে সেই আধ-পাগলা নিরঞ্জনের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুপরিপ্লুতমুখে বাষ্পগদ্‌গদ্‌ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রমেশ দাদা! আমায় আপনি চিন্‌তে পারেন নি? আমি তো মরিনি,—আমিই তো সেই পোড়ারমুখী সুখদা।"

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬